চোট - পাট বেত্তান্ত

দেবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

সারসংক্ষেপ

এই না-নিবন্ধ পশ্চিমবঙ্গের পাট শিল্প নিয়ে। খানিকটা মাঠকম্ম-নির্ভর ও খানিকটা দস্তাবেজ-নির্ভর পরিসংখ্যান পেশ করে দেখানো হয়েছে: (অ) অর্থ-শাস্ত্রীর হিসেব ও সরকারী হিসেবের সঙ্গে এই বিশেষ 'সংগঠিত' ক্ষেত্রের 'বাস্তব' হিসেব আদৌ মেলে না, ফলত, এই গোড়ায় গলদের জন্য অন্তিম গোদা জাতীয় আয় ও উৎপন্নের হিসেবে গরমিল থেকে যায়; (আ) অর্থনীতিশাস্ত্রের সার্বত্রিকতার দাবি ও নির্মিত বর্গমালাও ধোপে টেকে না। দেশ-কাল অনুযায়ী এমন বৈশেষিকতা তৈরি হয় যে ধ্রুপদী বিজ্ঞানবাদী সাধারণীকরণের কোনো ঠাঁই নেই। (ই) সংগঠিত ক্ষেত্রের মধ্যে অসংগঠিত ক্ষেত্রের সমাপতন ঘটে এবং সাম্প্রতিক অসংগঠিত ক্ষেত্রের প্রতি বিশেষ মনোযোগ শাসনতান্ত্রিকতা নির্মাণ করে; (ঈ) 'বুর্জোয়া' নামক বর্গ-চিহ্নটি কিভাবে নানান ছায়া-প্রচ্ছায়ার ধোঁয়াশাচ্ছন্ন অবয়বহীন তথা অশরীরী হয়ে যায়; (ঋ) প্রলেতারিএৎ নামক বর্গ-চিহ্নটিও অদৃশ্য ও শূন্য হতে হতে নিসর্গশত্রু অটোমেশনের দৌলতে প্রথমে বাড়তি ও শেষে মড়ায় পরিণত হয়; (এ) মড়া শ্রমিকের পুঞ্জীভূত শ্রম ভাঙিয়ে কেবল M - M'-এর চিহ্নময় অধিবাস্তবিক পরিসর নির্মাণ করে সংখ্যালঘু অতিধনীর বাড়বাড়ন্ত হয়; (ঐ) এই ক্রিয়াকাণ্ডের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ভূমিকা মিনিমাল, যদিচ বলপ্রয়োগের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রযন্ত্র দরকারী এবং মধ্যমেধাসম্পন্ন পার্টির পরজীবী ভূমিকা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, কেননা পার্টি এই কর্মকাণ্ডের মধ্যে বৈধতার অনাকরণিক মাত্রাদান করে।

এই রচনার লিখন শৈলী প্রচলিত আকাদেমিক ধাঁচে নয়, বরং দুই ভিন্ন গো-এষকের

আত্ম-প্রতি-বিম্বন নারীবাদী লিখনের নৈর্ব্যক্তিকতার ভড়ংহীন অভিভবে/অনুকরণে উপস্থাপিত হয়েছে। এই অ-নৈর্ব্যক্তিক আত্ম-বিম্বনের সঙ্গে যথা সম্ভব নির্মিত তথ্য ও তত্ত্বের মিশেল দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

০. পাটরানির কথামুখ

সরকার-বাহাদুর এবং তৎ-অনুগত আমলা-কর্মচারী, পুলিশ-মহান, বিচারক দণ্ডধারী, ধনপতি-কুবের এবং বিজ্ঞজন ব্যবসায়ী বিদ্যের — আপনাদের সকলকে গড় করে, নমো করে আরম্ভ করি পাটরানি-বেত্তান্ত। ভুলচুক হলে করে নেবেন না হয় ক্ষমাঘেন্না, কেননা নই আমি 'শিক্ষক' অর্থনীতির, এমন কী পাটী গণিতই বলুন অথবা পার্টী-পলিটিক্স — এ দুয়েই আমি নিতান্ত কাঁচা ও নবিশ। অতএব আমার এ রিপোর্টিং সবটাই রিপোর্টেড স্পীচে[১]। এক ফ্রাস্টু শ্রমিক-দরদী আঁতেলের মুখে শোনা কথা আপত্তি সহ আমার জবানি হিসেবে চালান করে

[১] ভলোসিনভ (১৯৮৬) তিন ধরনের আখ্যানে তিন রকমের কথা সাজানোর তরিকা বলেছেন: *প্রথম* ধাঁচায় লেখক তাঁর অবিসংবাদী *Author*-ity নিয়ে চরিত্রের মুখে কথা সাজান, লেখকের কথাই হয়ে ওঠে চরিত্রের প্রতিবেশ ও কথন; দ্বিতীয় ধাঁচার আখ্যানে ব্যক্তি চরিত্র কথা কন বটে, কিন্তু আবার নিজেকে 'লুকিয়ে' তাঁকে দিয়ে কথা 'কওয়ান' রিপোর্টেড স্পীচে — অথর গুপচুপ নিজের ভাবনা চালান করেন আখ্যান-প্রতর্কে; তৃতীয় ধারায় অথর এমন আখ্যান-লীলা বানান যেখানে এই গুপ্ত অথরিটেরিয়ান নিয়ন্ত্রণও ভোগে চলে যায়, তৈরি হয় Quasi direct discourse! নানান চরিত্রের কথার উতোরচাপানে অথরের পক্ষপাত হারিয়ে যায় পাঠকের কাছে। প্রতর্কের নানাবিধ মাত্রা পাঠককেও বহসের সাথি করে নেয়। আখ্যানকার অথর না হয়ে, হয়ে ওঠেন চরিত্র। এই তৃতীয় ধাঁচার চরম নমুনা আমরা পাই মানবী লিখনশৈলীতে, ভলোসিনভ পেয়েছিলেন উনিশ শতকের শেষার্ধের রুশি আখ্যানকারদের বয়ানে। জার্নালের তথাকথিত 'বৈজ্ঞানিক' লেখায় বস্তুমুখী অ-সংলগ্নতার যে ভান থাকে, আমার মনে হয়, তার মধ্যে পোরা থাকে ভলোসিনভ কথিত প্রথম ধাঁচার অথরিটেরিয়ান লিখনশৈলী; অথবা নিদেনপক্ষে দ্বিতীয় ধাঁচার রিপোর্টেড স্পীচে (শিডিউল নির্ভর সার্ভেতে এমন ধাঁচা মিলবে — যেখানে ব্যক্তিচরিত্রের ক্ষণিক সংকুচিত নির্মাণকেই স্থানু ধরে নেওয়া হয়) নির্মিত হয় 'বৈজ্ঞানিক' আখ্যান। এখানে, এই চোট-পাট বেত্তান্তের 'আমি' টেকনিকাল ইন্টেলিজেন্সিয়ার প্রতিনিধি হিসেবে দ্বিতীয় ধাঁচাটি গ্রহণ করলেও আখ্যানকারের পক্ষপাত ভলোসিনভ কথিত Quasi direct discourse-এ। অর্থনৈতিক তথা বৈজ্ঞানিক আখ্যানকেও নৈর্ব্যক্তিকতার ভড়ংহীন নারীবাদী লিখনশৈলীতে উপস্থাপিত করার আপ্রাণ প্রয়াস চালানো হয়েছে এই বয়ানে, যে কারণে পরস্পর বিরোধী দুটি চরিত্রকে রাখা হয়েছে এই চোটপাট আখ্যানে। এক্ষেত্রে আখ্যানকর্তার ঋণ Gouldner (১৯৭৯)-এর কাছে। গোল্ডনার একজন নিও-হেগেলিয়ান এবং আকাদেমিক্স-এর সমাজতত্ত্ব নিয়ে দিশারী কাজকম্মো করেছেন। কোনো 'বৈজ্ঞানিক' সমীক্ষায় বৈজ্ঞানিকের অধিকরণ নিয়েই তাঁর জিজ্ঞাসা! গ্রামশির অরগানিক

দিয়েছি থুড়ি টুকে মেরে দিয়েছি। অতএব এ বয়ান পুরোটাই "সঞ্জয়: উবাচ"।

পাট-রানির কথা কইতে গেলে রিস্ক আছে, ক্যালানি খাবার ভয় আছে এ পোড়া দেশে। দ্বিতীয়ত, এখন যে সব কথা আপনারা পড়তে চলেছেন পাটরানির চোটপাট নিয়ে, তা' আমি এভিডেন্স অ্যাক্ট ১৮৭২ অনুযায়ী প্রমাণ করতে পারবো না। তার মানে এ বয়ানের কোনো এম্পিরিকাল ও স্ট্যাটিস্টিকাল ভিত্তিই নেই। ভিত্তি থাকলে আমাকে চাটিবাটি গোটাতে হবে। আমি কি ভয়ের রাজত্বে বাস করছি? তৃতীয়ত আমার আবার ঐ অর্থনীতির শিক্ষকের মতো এলেম নেই, হাওয়া বুঝে কথা বলার মতো জ্ঞানগম্যি বা বুদ্ধি শুদ্ধিও নেই। এ কারণেই সব্বার আগে অলপ্পেয়ে কামচোর শ্রমিক আর চাষাভুষো বাদে সব্বাইকে গড় করে নমো করেছি।

অতএব, এই লেখায় যাহা যাহা লিখিত হইবে, তাহা তাহাতে usual disclaimers apply। ঠিক যেমন 'গুরু' সিনেমার আগে এই আইনী কথাটা পেড়ে নেওয়া হয়েছিলো, ঠিক সেইভাবে আমিও পেড়ে নিচ্ছি। আমি এখানে যে যে proper names ব্যবহার করবো, তাঁরা কেউ 'বাস্তব' চরিত্র নন কাল্পনিক চরিত্র, ঠিক যেমন গুরুকান্ত দেশাই ধীরুভাই আম্বানি নন। এখানে ব্যবহৃত নামের সঙ্গে আপনাদের নিজেদের নাম মিলে গেলে ভাববেন স্রেফ আপতিক ব্যাপার। এজন্য আমায় চৌপাট করার বন্দোবস্ত দয়া করে করবেন না।

আমার নিজের প্রমাণের দায় না থাকলে কি হবে, শিউচন্দ্রিকার রীতিমতন প্রমাণের দায়

ইনঅরগানিক ইন্টেলেকচুয়াল বিভাজন তাঁর বর্গমালায় দাঁড়িয়েছে টেকনিকাল ইন্টেলিজেন্সিয়া (যিনি তাঁর সাংস্কৃতিক পুঁজি 'পুনঃ' উৎপাদন করেন মাত্র, মডেল থিওরিটিক অ্যাপ্রোচে কাজ করে রাষ্ট্র ও সদাগরকে সহযোগিতা করেন) ও ইন্টেলেকচুয়াল (যিনি সদা জিজ্ঞাসামুখর, জ্ঞানীয় সাংস্কৃতিক পুঁজি 'পুনঃ'উৎপাদন না করে, উৎপাদন করেন এবং উদ্বৃত্ত শ্রম দানকারীদের কাছাকাছি থাকেন...)।

এই দুই বিপ্রতীপ চরিত্রকে এই বয়ানে পাশাপাশি রেখে যে আখ্যান তৈরি হয়েছে, তাতে ভাষাগত একটা সমস্যাও তৈরি হয়েছে। এই বয়ানে টেকনিকাল ইন্টেলিজেন্সিয়া তাঁর পরিসরের মধ্যেই যে অর্থ-তন্ত্রে নিষ্ণাত থেকে পরিভাষা কণ্টকিত Critical discourse তৈরি করেন, তার সঙ্গে তফাৎ হয়ে যায় আকাদেমিকস্-এর ভিক্টিম ফ্রাস্টু-ব্যবহৃত ভাষার বা এই বয়ানের আখ্যানকারের ভাষায়। আখ্যানকার আর ফ্রাস্টু যেন সরে আসছেন Critical discourse-এর নির্মিত 'rationality' থেকে, শ্রমিকের ভাষাতেই শ্রমিকের কথা বলার চেষ্টা করছেন কোয়াসি ডিরেক্ট ডিসকোর্সে, যা মাঝে মধ্যেই Critical discourse-এর শালীনতার নির্মিত সীমা লঙ্ঘন করছে। আখ্যানকার ও ফ্রাস্টু যেন তাঁদের 'অশালীনতা'র মধ্য দিয়ে পুরোনো একটা প্রশ্নকে ফের বলছেন: পাগলামির ইতিহাস অপাগলামির ভাষায় লেখা যায় কি?

চোটপাট বেত্তান্তের আখ্যানকার গবেষণার বিষয়-বিষয়ী-বিশ্লেষককে একই বয়ানে ঠাঁই দিয়ে ফেলেছেন।

ছিলো। কে বে শিউচন্দ্রিকা? মনে নেই আপনাদের, সতীনাথ ভাদুড়ি নামে কে একজন কোথাকার 'সাহিত্যিক' (সমাজ বিজ্ঞানী তো নন!) চটকলের ব্যাপার-স্যাপার নিয়ে একটা ঘ্যাম উপন্যাস লিখেছিলেন: *চিত্রগুপ্তের ফাইল*। সেখানে যে চটকলের কথা আছে, তার ইউনিয়ন লীডার হলেন গিয়ে শিউচন্দ্রিকা। তা একবার হল কি, কল্যাণকামী সরকার শ্রমিকদের ভালোবেসে শ্রমিকদের বাচ্চাদের জন্য ক্রেশের আর শ্রমিকদের জন্য সস্তা ক্যান্টিনের বন্দোবস্ত করলো। বারে, শ্রমিকদের জন্য রাষ্ট্রের দরদ নেই বুঝি? আপনারা যাঁরা মার্ক্স না পড়লেও দীপেশ চক্কোত্তি মশাই-এর ১৮৯০-১৯৪০-এর চটকল শ্রমিকদের বেত্তান্ত 'পড়েছেন', তাঁরা তো জানেনই, সেখানে মার্ক্সসাহেবকে কোট করে বলা আছে, শ্রমিক-কল্যাণে ফ্যাক্টরি অ্যাক্ট হল গিয়ে, "cry of capitalists for equality in the conditions of competition, i.e., for equal restraint on all exploitation of labour." না, এখন এসব কথা বলা 'পলিটিকালি কারেক্ট' হবে না, বরং শিউচন্দ্রিকার কথা কই।

তা' ক্রেশ আর ক্যান্টিনের জন্য বরাদ্দ টাকা এল বটে, কিন্তু ও দুটো আর মিল-ম্যানেজার ম্যাকলিন সাহেবের করা হয়ে উঠলো না। তার বদলে দেখা গেল, তাঁর একটা নোতুন টেনিস কোর্ট হয়েছে, এ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজারের নোতুন কোয়ার্টার, অন্য অফিসারদের তিনটে কোয়ার্টার্স হয়ে গেল আর অবশিষ্ট লোহার শিক আর সিমেন্ট কালো বাজারে বেচেছে এ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার।

লেবার অফিসার এসব 'কুকথা' বলতে বারণ করে দেন শিউচন্দ্রিকাকে: "যা *প্রমাণ* করতে পারবেন না সে সব কথা বলে লাভ কি? তাতে কি আপনার কাজ এগোবে?"

শিউচন্দ্রিকা ভীষণ গাঁট — এসব কথা প্রমাণ করেই ছাড়ে — একদম কাগজে কলমে প্রমাণ।

কিন্তু আজ আমি আর শিউচন্দ্রিকাকে খুঁজে পাচ্ছি না। পশ্চিমবঙ্গের ৫৯টি চটকল, যা কিনা কোলকাতার উত্তরে এবং দক্ষিণে হুগলি নদীর দুপাশ জুড়ে রয়েছে প্রায় ৬০ মাইল লম্বা ও ২ মাইল চওড়া এলাকায়, সেখানে গরু খোঁজা করেও শিউচন্দ্রিকাকে পেলুম না। এমন কী ৫৯টা চটকলের কোথাও ক্রেশ আর ক্যান্টিন আজ আর নেই। শ্রমিক মহাল্লার যা অবস্থা, তার বর্ণনা অনায়াসে এঙ্গেল্স-এর The condition of the working men in England থেকে টুকে, মেরে, ঝেড়ে, একটু এদিক ওদিক করে, বসিয়ে দেওয়া যায়। তবে কিনা শ্রমিকদের এমন

কষ্টেই থাকা উচিত। শিউচন্দ্রিকার মতো লীডারদের আজ বিপন্ন প্রজাতি হওয়াই উচিত। তবে এখন যাঁরা আছেন, তাঁরাও সবাই মাননীয়, নমস্য, প্রশংসনীয় — চাষাভুষো আর শ্রমিক বাদে আর সবাই অনারেবল পার্সন্স।

তা' আমি চটকলে বা পাট চাষের জমি-জিরেতে গরু খোঁজা করতেই বা বেরিয়েছি কেন? গরু খোঁজা মানে গো-এষণা মানে গবেষণা! না মশাই, গবেষণা করার সদিচ্ছে আমার আদৌ নেই, এলেমও নেই। আমি আসলে ইয়ে মানে খুব বড়লোক হতে চাই, এমন বড়লোক যে আমি চারপাঁচটা রাঁঢ়কে পাটরানি করতে পারবো, বৈদিক গ্রামে চারচাকা গাড়ি নিয়ে গিয়ে পেলব হাতের ম্যাসাজ খেতে পারবো। যখন ইচ্ছে অতি প্রাচীন সুরাপান করতে পারবো ইত্যাদি। এবং চটশিল্পে বিনিয়োগ করে এবং পাশাপাশি চটশিল্প নিয়ে পেপার লিখে আমি এসব করতে সক্ষম হব বলে আমার ধারণা, কেননা সবুজ নিষেধাজ্ঞায় পলিমারের দিন যদি অবসিত হয়, তাহলে পাটশিল্প ও ব্যবসার রমরমা হওয়ারই কথা; আর এসব নিয়ে ঘ্যাম পেপার করলে যে বড়লোক হওয়া যায় — এতো বলাই বাহুল্য। এবার আমি চোটপাটের বেত্তান্তের নোট্সগুলো ঐ সেই ফ্রাস্টু আঁতেল ব্যাটার নির্দেশে এখানে জড়ো করছি ও আপনাদের মতো গুণিজনের সামনে পেশ করছি। আপনারা আমায় সাহায্য ও পরামর্শ দেবেন এই আশায়।

আমার গল্পের ধাঁচাটা হবে ঐ 'চিত্রগুপ্তের ফাইল' মোতাবেক। এখানে যেটা বলা জরুরি যে 'চিত্রগুপ্ত' একজন ব্যর্থ লেখকের ছদ্মনাম। ইদানীং তিনি ডাকযোগে গল্পের প্লট বাৎলান অথবা গপ্পো-লেখা শেখান। তিনি গপ্পো-লেখককে কয়েকটা নির্দেশ দিয়েছেন; তার মধ্যে একটা আবার এইরকম: "ফিকা গোছের রাজনীতি" এবং "শোষক-শোষিতের সংঘর্ষের কথা যেমন করিয়া হউক গল্পের ভিতরে আনিতে চেষ্টা করিবেন।" উপন্যাসের অন্তিমে এমনতর নির্দেশ পেয়ে আমার মনটা বেঁকে বসলো। আমি আমার বড়লোক হয়ে ওঠার (বিকামিং) গপ্পে ব্যবহৃত — ব্যবহৃত হতে হতে ক্লিশে শুয়োরের মাংস হয়ে যাওয়া — এইসব পরিভাষাগুলো আনবোই না। অর্থাৎ মানে হলো গিয়ে আমি নিম্নবর্গের কথা বলা/না-বলাকে বা তাদের 'শোষিত' হবার ব্যাপারটাকে অত্যধিক আপেক্ষিক গুরুত্ব/প্রিভিলেজ/প্রায়রিটি না-দিয়ে বরং বড়লোক বেত্তান্তটা সোজাসাপ্টা বলে ফেলবো। এতে আমার দুটো উদ্দেশ্য একসঙ্গে সাধিত হবে: প্রথমত চট ব্যবসা করে, চট শিল্পে লগ্নি করে বড়লোক হওয়ার ইচ্ছে পূরণ হবে এবং দ্বিতীয়ত Subaltern Studies-এর বিপরীত ক্রমে Superordinate Studies বিভাগ খোলার পথ প্রস্তুত হবে। এই বিভাগের প্রধান শর্ত হবে এই: জ্ঞানোৎপাদন করে বড়লোক হতে হলে

এরকম নন-হিপোক্রিট ডিসিপ্লিনারি হাইটেক জানা জরুরি এবং এরকম কাজ বিদ্যে-ব্যবসায়ীর নৈতিক দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। আমরা তো দেখেছি, যিনি নিম্নবর্গের দারিদ্র নিয়ে গো-এষণা করেন, তিনি ঘ্যাম বড়লোক হন। আমি এখানে দুটো ব্যবসাকে একটু মিলিয়ে পড়ছি, বিজ্ঞজন ক্ষমা করে দেবেন। গো-এষণার আগে তো উদ্দেশ্য-বিধেয় বলে নিতে হয়, তাই এসব কথা পাড়লুম।

চিত্রগুপ্ত মশাই উপন্যাসের অন্তিম পাদটীকায় জানাচ্ছেন, "এই নির্দেশগুলো ১৯৪৭-৪৮-এর জন্য। প্রতিবৎসর প্রয়োজন মতো ইহার পরিবর্তন করা হয়।" এর জন্য অবশ্যি বার্ষিক ১০ টাকা চাঁদা দিতে হয়। সে টাকা আমি একজন উঠতি লেখক-ব্যবসায়ী হিসেবে তাঁকে আগেই পাঠিয়ে দিয়েছি। তিনি নোতুন নির্দেশ আমায় পাঠিয়ে দিয়ে বলেছেন, "তেমন কিছু বদলাতে হবে না চটকলের ক্ষেত্রে। শুধু খেয়াল রেখো ভারত মহানের আইন-কানুন লঙ্ঘন নয়, 'এড়ানো' বা 'avoid' করার নানান তরিকা। এরজন্য তুমি How to *avoid* income tax গোছের কিতাব পড়তে পারো।"

১. গো-এষণা 'পদ্ধতি' (?)

গো-এষণার উদ্দেশ্য বিধেয় তো বাৎলালাম, এবার গবেষণার দস্তুর মাফিক গরু-খোঁজার পদ্ধতি বিষয়ে কিছু বলতেই হয়। আমার আবার পদ্ধতি বিষয়ে তেমন দখলদারি না থাকায় হাজির হলুম ঐ ফ্রাস্টু বিদ্যে-ব্যবসায়ীর কাছে। ব্যাটা ১৭ বছর ধরে একটা বিদ্যায়তনে টেকনিকাল ওয়ার্কার থেকে লেকচারার অব্দি উঠতে পেরেছে কোনক্রমে। ডক্টরেট ডিগ্রধারী ও গাদি গাদি গো-এষণা পত্রের বাবা এই মালটি ঝাড়ও খেয়েছে সাংঘাতিক। হিঁদুয়ানির সরকারি বাড়বাড়ন্তের (অ-)সময়ে হিঁদুয়ানির বিরুদ্ধে কথা কয়ে, পার্লামেন্টে রেফারড্ হয়ে মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক থেকে একটা অ্যাওয়ার্ড বাগায় — নন-রেসিডেন্সিয়াল ফেলোশিপের প্রাইজ। এবার সেটা এ্যাটেন্ড করতে গিয়ে সরকারি নিয়ম মোতাবেক প্রায় লাখ খানেক টাকা লস করে বসে। আপাতত সে থাকে বরানগর জুটমিলের কাছাকাছি একটা বৈষ্ণব আখড়ার পাশে সামান্য উন্নত বস্তিতে। এবং সে এখন নিজেকে কখনও বলে বিদ্যে-ব্যবসায়ী, কখনও বলে বিদ্যে-এজেন্ট বা কখনো বিদ্যে-শ্রমিক। তার মতে, "আমাদের মতো কলোনিতে সাহেবি মডেল আসে — আমাদের বিদ্যে-কারখানায় সেই মডেলে ডেটা ফিড ও ফিট করতে হয়। এখানে নলেজ থুড়ি

ইনফরমেশন প্রোডিউসড্ হচ্ছে। এল. আই. সি.-র এজেন্টের যেমন ক্লায়ান্ট ধরার টার্গেট থাকে। টার্গেটে পৌঁছতে পারলে আমার ব্যবসা সফল। অতএব আমি একাধারে বিদ্যে শ্রমিক-এজেন্ট-ব্যবসায়ী।"

কিন্তু এই ফ্রাস্টু ব্যাটা পাটকলের ব্যাপারে জ্ঞানোৎপাদনে গররাজি। ওর মতে, এখানে জ্ঞানোৎপাদন করলে সুবিধে হবে তাদের, যাদের ও বিরোধিতা করে: রাষ্ট্র ও সদাগর। ফ্রাস্টু ব্যাটা বলে, "দেখ, চট শ্রমিকদের সঙ্গে আমার দহরম-মহরম বিশ বছরের। বরানগর জুটমিলের সামনে যখন আমি ধর্না দিয়েছি, তখন টেকনিকাল ওয়ার্কার হিসেবে ওদের মাইনের সঙ্গে আমার মাইনের ফারাক ছিল খুব সামান্যই। মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক যেমন আমার গাঁড় মেরেছে, আমার লাখ টাকা মায়ের ভোগে পাঠিয়েছে, তেমনি শ্রমিকদের টাকা পয়সা — পি. এফ-গ্র্যাচুইটি, ই. এস. আই., মজুরি — এসব ঝেড়েছে বহাল তবিয়তে থাকা মালিক। অবশ্য চটকলের মালিক যে কে সে ভগাই জানে। এখানেই আমার সঙ্গে শ্রমিক চাষীর এনগেজমেন্ট। আর আমি তো তোর মতো জাতে উঠতেও চাইনা, তাহলে এই নিপীড়িতদের সঙ্গে আমার সংযোগ ছিন্ন হবে।"

কিন্তু, চট নিয়ে চটপট আমায় জ্ঞানোৎপাদন করতেই হবে — টেকনিকালি ব্যাপারটা বলতে হবে, তত্ত্বকথা দিয়ে ব্যাপারটা সাজাতে হবে। আবার ও ওর নিজের কথাই বলে যাচ্ছে। শালা, এ্যাওয়ার্ড নিয়েছিলি কেন? "আবে লে মুঝে মার" বলে যদি কেউ তার পাছা এগিয়ে দেয়, তো তাকে কেলানোই উচিত। চটকলের শ্রমিকগুলো যেমন ত্রিপাক্ষিক চুক্তির পর লাভের আনন্দে আবির মেখে নাচে, হাতে চটের সুতুলি দিয়ে রাখি বাঁধে — তারপর দেখা যায় যে কে সেই, ত্রিপাক্ষিক চুক্তি মোতাবেক কোনো কথাই রাখা হয় না। এসব ঠিকমতন বুঝতে গেলে আমার একটা মডেল তথা পদ্ধতি দরকার, মডেল- থিওরিটিক অ্যাপ্রোচে কাজ করতে অভ্যস্ত কিনা!

আমি গত্যন্তর না দেখে ওকে বল্লুম, "ফ্রাস্টু দাদা, তুমি আমায় এমন এক পদ্ধতি বাৎলাও দেখি, যাতে পাটের পাটী গণিতটা আমি বুঝে যাই এবং একটা পেপার নামিয়ে কল্যাণকামী রাষ্ট্রকে একটু হেল্প করি। গৌতম সরকার(১৯৮৯), শিশির মিত্র(১৯৮১) থেকে অজানা শঙ্কর দাস-এর মূল্যবান লেখাপত্তর বা নাগরিক মঞ্চের দলিলগুলো যতই পড়ছি ততই হিসেব-টিসেব গুলিয়ে-মুলিয়ে একাকার হয়ে যাচ্ছে। হিসেবে হেব্বি গরমিল, যেমন ধর শ্রমিক কমছে ও না খেতে পেয়ে মরছে, কিন্তু উৎপাদন বাড়ছে, রপ্তানি বাড়ছে-কমছে তো অভ্যন্তরীণ চাহিদা ও

যোগান বেড়েই চলছে। আবার উৎপাদিত কাঁচাপাটের মজুত ও পাটজাত পণ্যের বিক্রিবাটার পাট-ী গণিত মিলছে না। সবাই বলছে, পাটশিল্প 'রুগ্ন', অথচ সাধারণ ডেবিট-ক্রেডিটের হিসেবের সঙ্গে মিলছে না মানে পরিসংখ্যানের সঙ্গে রুগ্নতার লজিক মিলছে না। কি করি বলতো? এই খেলাটা একটু বুঝিয়ে ধরে দে না বাপু।"

— হুম, খেলাই বটে। ছোটবেলায় একটা খেলা খেলতুম মনে আছে — রাজা-রাজা খেলা? দুটো দল আছে — দু'দলে দুজন রাজা। দু'দলের প্রত্যেক খেলোয়াড়ের ফল-ফুল-লজেন্স জাতীয় নিকনেম গোপনে দেওয়া আছে। এক নম্বর দলের একজনের চোখ বন্ধ করে রাখলো বিপক্ষের রাজা। সে রাজা নিকনেমে তলব করলো তার দলের একজনকে। সেই খেলোয়াড় এসে চাঁটি মেরে গেল ঐ চোখ-বন্ধ করা খেলোয়াড়কে। এবার তার চোখ খোলা হল। আবৃত্ত হল একটা ছড়া, "ক খ গ ঘ ঙ। কে মেরেছে বলো না। *রাজার দিকে চেও না*। বলে দিলে খেলবো না।" চাঁটি খাওয়ার পরে চোখ খোলে, অন্ধতা ঘুচে যায়, "রাজার দিকে চেও না"-র মতো 'শর্তহীন' নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও চাই রাজার দিকে। রাজার কাছে আগে থাকতেই আমার সাঁট ছিল, রাজা শরীরী ইঙ্গিতে জানিয়ে দেবেন আমাকে ঘাতকের প্রপার নেম, নিকনেম নয়। এবার আমি-খেলোয়াড় তাকে আইডেন্টিফাই করে পাল্টা চাঁটি মেরে আসবো। আমি যত ভালো এই খেলার নিয়ম এড়াতে পারবো, ততই এগোবো জেতার দিকে। এখানে দেখ দুটো খেলা আছে। খেলা-১ নিয়মের খেলা আর খেলা-২ নিয়ম-এড়ানোর (লঙ্ঘনের নয়) ছায়া-খেলা। এবার চোট-পাট-লোপাট বেত্তান্তে এই খেলা-২'কে তুই দেখতে পাবি এবং দেখতে পাওয়া মাত্র ক্রমাগত ইন্টারোগেট করতে থাকবি। মনে রাখিস, তোর এই গো-এষণা খেলায় তুইও তো একজন খেলোয়াড়। তুই নিজেকে প্রশ্ন করবি, তুই খেলা-২'এর যে মডেল লাগু করছিস, সেটা কেউ তোকে বাধ্য করে করাচ্ছে, নাকি তুই 'স্বেচ্ছায়' করছিস, নাকি খেলা-১ থেকেই খেলা-২ উঠে আসছে। সে খেলার খেলোয়াড়রা একা একা নিজে নিজে খেলছে, নাকি অন্য কেউ তাকে দিয়ে এমন খেলা খেলাচ্ছে?

আমি বলি, "হ্যাঁরে, এটা কি গেম থিওরিটিক অ্যাপ্রোচ?" হো হো করে হেসে ওঠে ফ্রাস্টু। বলে, "নারে, ওসব মডেলে বিশেষ করে গেম থিওরির মডেলে একটা প্রিসাপোজিশন আছে, খেলোয়াড়রা নাকি সবাই কম্প্যুটারাইজড র‍্যাশানাল এজেন্টস্। আমি পাঁড় ফুকোল্ডিয়ান — র‍্যাশানালিটি- ইর‍্যাশানালিটির সীমারেখা আমার কাছে ধোঁয়াশাচ্ছন্ন — ব্লার হয়ে গেছে। আর, খামোখা আমি মডেলের দ্বারস্থ হতে যাবো কেন, আমার ভুবনকে আমি এমন আঁটো

সাঁটো প্রাক্-নির্ধারিত অ-জ্যান্ত খোপে বন্দি করি না। এই র‍্যাশানালিটির প্রাকশর্ত দিয়ে গেম থিওরিতে আঁক কষার সময় এই কম্প্যুটারাইজড র‍্যাশানাল এজেন্টরা দ্বানুক বা binary অ্যালফাবেটে পরিণত হয় — এক ধরনের বিমূর্তায়ন, সংকোচন ও স্থানান্তর ঘটে খেলোয়াড়দের। তারপর সম্ভাব্য সমস্যাজনক পরিস্থিতি তৈরি করে সম্ভাবনার আঁক কষা হয়। p আর q কি কি করিতে পারে বা পারে না সেটা ঠাণ্ডা ঘরে বসে হিসেব করে ফেলা হয়। ওটা বিদ্যে-ব্যবসায়ীদের বিলাস। ওরা ভাবে আঁক কষেই জ্যান্ত সমস্যার সমাধান বাৎলে দেবে। আর এই মডেলের রোগ কি জানিস? ঐ যে যাঁরা ইচ্ছে করে রোগা হয়ে র‍্যাম্পে হেঁটে রেড়ান, তাদের রোগ। তাঁদের রোগ হল অ্যানোরেক্সিয়া নার্ভোসা: পুষ্টিকর খাদ্য খেলে এঁদের বমি হয়; অথবা বুলিমিয়া হলে ইচ্ছে করে গলায় টুথ ব্রাশ ঢুকিয়ে বমি করে দেন। এই মডেলরা গরিব-গুর্বো অপুষ্টিতে ভোগা কুড়িতে বুড়ি হয়ে যাওয়া মাগীদের সিম্যুলেশন বা ভান। মডেল-থিওরিটিক অ্যাপ্রোচ করা বৈজ্ঞানিকরাও এই র‍্যাম্পে হাঁটা সোন্দরিদের মডেল অ্যাপ্রোচে সিম্যুলেট করেন। এঁদের তুই সক্রেটিস থেকে মার্ক্স-সার্ত-রাসেল অব্দি যে কোনো নবীন দার্শনিকদের পুষ্টিকর লেখা পত্তর পড়তে দে, দেখবি কেমন বমি করেন এঁরা। আর আমার এই খেলার ব্যাপারটা এমন একটা না-মডেল, যার ধ্বংসের বীজ নিজের মধ্যেই পোরা আছে।[২]

এই কথা বলার সময়েই, হঠাৎ-ই ফ্রাস্টুর ৩১০ স্কোয়ার ফিটের সামান্য-উন্নত বস্তির পাশ থেকে দমাদ্দম আওয়াজ শোনা গেল। চটকল-বিতাড়িত শ্রমিকরা কোনো আইনের তোয়াক্কা

[২] মডেল থিওরিটিক এ্যাপ্রোচের বিরুদ্ধে তামাশামূলক সমালোচনার জন্য দ্র: ফেয়ারাবেন্ড (১৯৯৪)।

জ্ঞানের 'ভিত্তি'/'মূল' ইত্যাদি ব্যাপারগুলোও এমন খাপছাড়া বিজ্ঞানের দার্শনিকদের বয়ানে আক্রান্ত হলেও, এব্যাপারে গুরুপ্রতিম হলেন নীৎসে ও তাঁর বহুপরিচিত দুই প্রশিষ্য। তাঁর এক প্রশিষ্যের (নাম তাঁর দেরিদা) হাত ধরেই এমন না-পদ্ধতি ফেঁদেছেন ফ্রাস্টু (দ্র: Derrida, ১৯৭৬/১৯৯৪) কিন্তু ফ্রাস্টুর শেষ বচনটি একটি বিশেষ উপপাদ্যের পুনঃকথন Gödel's Theorem (১৯৩১)!

একটা সময় ভাবা হয়েছিলো, যেমন ভেবেছিলেন হিলবার্ট, গণিতের যাবতীয় সমস্যার আকৃত সমাধান সম্ভব। সেই সর্ব-আকরণিক খোয়াবে তাঁর ভেবে ওঠা আর হয় নি যে, যে কোন আকৃত তন্ত্রের মধ্যেই অসম্পূর্ণতা তথা সম্পূর্ণ বিরোধাভাসিত বচনের অন্তর্ঘাতী উপস্থিতি থাকতে পারে। কূর্ট গোয়ডেলের অসম্পূর্ণতার উপপাদ্য এমন খেইটাই ধরিয়ে দিল: যাকে স্বয়ং সম্পূর্ণ আকৃত তন্ত্র হিসেবে ভাবছি, তাকে নিয়ে সত্যতার দাবি পেশ করছি, অন্তিমে তার ভেতরেই স্ব-পক্ষে বিপক্ষ গজিয়ে থাকে। "(এই বন্ধনীভুক্ত বচনটি মিথ্যে)" যেমন সত্য-মূল্যনির্ধারনকারী তর্কশাস্ত্রের আকরণতন্ত্রের খোপে আত্মবিধ্বংসী এবং আকরণতন্ত্রের খোপ যে নিশ্চিত অসম্পূর্ণ, তা দর্শিয়ে দেয়, গ্যোয়ডেল উপপাদ্য এই বিরোধাভাসেরই বিস্তার।

না করেই এই গৃহাঙ্গনেই একটা বলপ্রেস ফ্যাক্টরি খুলেছে। ফ্রাস্টু বারণ করেছিলো, দূষণ পর্ষদ থেকে শুরু করে ডিরেক্টোরেট অব্ ফ্যাক্টরিজ মায় পরিবেশ মন্ত্রক অব্দি আবেদন-নিবেদন করেছিলো এবং ইন্সপেক্টররাও এসেছিলেন, পরিদর্শন করে 'পান-সিগারেট' পেয়ে চলে গেছেন। কিন্তু প্রায় ১০০ ডেসিবেল শব্দ-উদ্গীরণ করে বিতাড়িত চটকল শ্রমিকদের সেই ফ্যাক্টরি চলছে, চলবে।

সেদিন ৪ জানুয়ারি, ১৯৯৪। দূষণ পর্ষদের অভিযোগ অনুযায়ী সুপ্রিম কোর্টের রায়: গঙ্গাদূষণের জন্য দায়ী বরানগর জুটমিল বন্ধ করে দিতে হবে। কুজনে বলছে, মালিকই নাকি উদ্যোগ নিয়ে দূষণের অভিযোগ এনেছেন, কেননা ফ্যাক্টরি ল'তে অনুল্লেখিত 'সাস্‌পেনশন অফ্ ওয়ার্ক'এর নোটিশ ঝুলিয়ে কারখানা আর কদ্দিন বন্ধ রাখা যায়?

এইখানেই কি খেলা-২? আওয়াজের চোটে ফ্রাস্টুর বস্তিতে আর থাকতে পারছিলুম না। হাঁটতে হাঁটতে বাড়ি ফিরতে গিয়ে অনেক কথা মনে হচ্ছিল। কারখানাকে 'রুগ্ন' দেখিয়ে, কারখানা বন্ধ করে মালিকের কি লাভ? পাশে পাশে পরিসংখ্যান মিলিয়ে দেখছি যে পাটজাত দ্রব্যের উৎপাদনও কোনদিন কমেনি। একি প্যারাডক্স?

চিররুগ্ন ফ্রাস্টু আমাকে এগিয়ে দিতে এসেছিলো। আমার এমত ভ্যাবাচ্যাকা প্রশ্নে ও সাড়া দিল, "রোগের মেটাফরে নিজেকে সাজিয়ে নিয়ে অসুখের ভান করলে সহানুভূতি ছাড়াও অন্য কিছু মেলে — যেমন ধর 'ত্রাণ' বা 'রিলিফ'। খরা-বন্যা-রুগ্ন কারখানা রোগ বটে, এ

সমকালীন অর্থনীতিতে যতই গণিতের বাড়বাড়ন্ত হোক, আমার স্বল্পজ্ঞানে গ্যোয়ডেল উপপাদ্য নিয়ে কথা কইতে কাউকে শুনিনি। অথচ দেখছি, অর্থশাস্ত্রকে প্রকৃতিবিজ্ঞান-সম করে তোলার আকরণিক দাবি দাওয়া (শিকাগো অর্থশাস্ত্রীরা এ বিষয়ে গুরু) শেষ অব্দি সৌরকলঙ্ক তত্ত্বও ফেঁদে ফেলেছে (তা সেটা আদর পাক বা না পাক!)। গ্যোয়ডেল আকারতন্ত্রের অন্তিম দাবিকে অসম্পূর্ণ ঘোষণা করলেও দেখছি গেম থিওরিতেও বিমূর্তায়িত অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানের হাস্যকর প্রয়াস। ফ্রাস্টু এই জায়গা থেকেই এমন আকারতন্ত্রের কথা পাড়ে, যাতে স্বপক্ষে বিপক্ষ বর্তমান। এবং চোটপাট বেত্তান্তের অন্তিমে দেখা যাবে, তথাকথিত সাংগঠনিক আকরণে বিধি বহির্ভূত অসাংগঠনিক ক্ষেত্রের সমাপতন — আকরণে অনাকরণ এবং ফ্রাস্টু হয়তো ভবিষ্যতে বীরভূমের মল্লাবপুরের খাদান ঘুরে এসে দেখাবে তথাকথিত অনাকরণে আকরণ। এমতাবস্থায় সাংগঠনিক ও অ-সাংগঠনিক ক্ষেত্রে জল-অচল বিভাজিকা বিপদে পড়ে যাবে, যে অর্থশাস্ত্রীরা এই দ্বন্দ্বকে স্থবির ধরে কাজ করছেন তাঁরা ফাঁপরে পড়বেন এবং এসবের পেছনেই যে জ্ঞানীয় ঐতিহ্য কাজ করবে, তা অবশ্যই এরকম: রাসেলের বিরোধাভাস (১৯১৩), গ্যোয়ডেল উপপাদ্য ও দেরিদীয় অবস্থান। এই বিশেষ উপপাদ্যের ব্যাখ্যার জন্য পাঠক দেখতে পারেন Hersh (১৯৯৭) অথবা Penrose (১৯৯০, ১৯৯৪)।

রোগের প্রিভেনশন নেই কিন্তু কিওর-বাবদ রিলিফ আছে। সাইনাথের() লেখা পড়ে দেখ, খরা-বন্যা মহামারী দেখিয়ে ত্রাণ বাবদ কন্ট্রাক্টর-মারফৎ যে টাকা গচ্চা দিয়েছে আমাদের সরকার-মহান, তা' চা-কফি-সিমেন্ট-অটোমোবাইল-এর সমবেত বার্ষিক লভ্যাংশের প্রায় সমান বা বেশি। চটকলেও রুগ্নতার দরুণ বহু টাকার বরাদ্দ আছে। রুগ্নতার প্রতি আমাদের সহানুভূতি যদি সাংস্কৃতিক অভ্যেস হয়, তা হলে রুগ্নতা দেখিয়ে ফয়দা তোলা আমাদের রাজনৈতিক অভ্যেস। কোনো ডাক্তার বা উকিল বড়লোক হলেই বুঝবি যে আমরা ভালো নেই রে। পরোপকারী ইউনিয়ন লীডার (শ্রমিকের ডাক্তার) বড়লোক হলেও ঐ একই কথা, মালিকের বড়লোক হওয়ার কথা না হয় ছেড়েই দিলুম — তবে আমার মতো রুগ্ন সদা বিষণ্ন ফ্রাস্টু খাওয়া তথা ঝাড়-খাওয়া মানুষ আরো বেশি করে ঝাড় খাওয়া চাষাভুষো কুলি কামিনদের দিকে তাকিয়ে আর সহানুভূতির কাঙাল হয় না। বরং আমার মতো ঋণগ্রস্তের কষ্ট ওদের কষ্টের থেকে কম জেনে ম্যাসোকিস্ট তৃপ্তি পাই। যাকগে, আমার এসব পার্সোনাল এনগেজমেন্টের সাবজেক্টিভ কথাবার্তা। কেননা এই 'নৈর্ব্যক্তিক'(?) সমীক্ষায় এসব ব্যক্তিগত কথা বল্লে লোকজনের আঁতে ঘা লাগবে। আমার মতো সমীক্ষকের self-reflexivity-কে তাঁরা ভাববেন আত্ম অবমাননা বা self-pity। অথচ, ব্যাপার হল গিয়ে আমি-বিষয়ী গবেষক-খেলোয়াড় হিসেবে সংগঠিত ধনবাদের তৈরি করা বিরোধগুলোর মধ্যে ঢুকে গিয়ে যখন spying করছে, তখন তার অধিকরণ তাকে কিন্তু ক্রমাগত ঠেলছে, লেখার সময় সেটা চেপে যেতে বাধ্য হচ্ছে বা বাধ্য করা হচ্ছে। গো-এষকের এহেন নিউরোসিসকে কেউ কিন্তু তথাকথিত নৈর্ব্যক্তিকতার খাতিরে পাত্তা দিতে চাইছেন না। প্রশ্নটা এটাই: গবেষক বিষয়ীর self-engagement-এর বেত্তান্তটা কি? যাইহোক্, এখন ভাবতো দেখি কোন খেলাটা খেলবি কখন: ১ নম্বর খেলা নাকি খেলা - ২-এর ছায়া খেলা?

আমি বড়লোক হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় এখন প্রায়শই 'গুরু' সিনেমাটা দেখি। গুরু মুম্বাই-তে বস্ত্র-ব্যবসার জন্য প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র কিছুতেই কন্ট্রাক্টর সাহেবের কাছ থেকে পাচ্ছে না। গুরুভাই কন্ট্রাক্টরের গল্ফ কোর্টে হাজির হয়। কন্ট্রাক্টর গলফ্ কোর্টের নির্দিষ্ট গর্তে বল ফেলতে বলেন, তবেই কিনা ছাড়পত্র মিলবে। গুরু হাতে করে বলটা তুলে নিয়ে নির্দিষ্ট বিবরে ফেলে দিয়ে আসে। এই 'চালাকি'টাই কি খেলা-২? ছায়া-জুয়ার চালাকি খেলা?

২. ভ্রম-ভ্রমণ-বিভ্রম তথা একটি মাঠকম্ম

এরপর ওর সঙ্গে বেরিয়ে পড়লুম ভ্রমণে, কিন্তু ভ্রমণে যে এত বি-ভ্রম তা' কে আর

আগে থাকতে জানতো! ফ্রাস্টুর আবার পেশাদারি মাঠকম্মে বা যাকে বলে শিডিউল-নির্ভর ফিল্ড ওয়ার্ক বা সার্ভেতে ঘোরতর আপত্তি। ওর মতো ফুকোল্ডিয়ানের মতে, তাতে নাকি রাষ্ট্র ও সদাগরের শাসন ত্রাসনের সুবিধে করে দেওয়া হয় এবং এতে সমাজের নিপীড়িত মানুষ গিনিপিগ হয়, তারা শ্রমদিবসের জন্য নিয়োজিত খানিকটা সময় হারায় এবং বারংবার শিডিউল-ভিত্তিক প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে বোর হয়ে গিয়ে নিজের দুঃখকষ্টের কথা ভুলতে বসে বা দুঃখ কষ্টের কথা বলে এমন এক পারগেশন হয় যে মনের মধ্যে অলীক এক প্রশান্তি নেমে আসে। এরপর ফ্রাস্টু ব্যাটা ফুকো ঝেড়ে স্টেট ও স্ট্যাটিস্টিক্সের আনহোলি নেক্সাসের কথা বলে আমাকে বোর করতে থাকে। আরে বাবা, আমি 'সহজে বড়লোক হইবার উপায়' বিষয়ে গো-এষণা করতে বসেছি, এসব কথা আমার ভালো লাগে না। হুঁ, ও ব্যাটা বলে কিনা, সার্ভের মধ্যে ভায়োলেন্স আছে!

এবার আমার শুরু হল ভ্রমণের ভ্রম — এমন ভ্রম যে একমাত্র ভগা ছাড়া অন্য কোনো বেটা আগে থাকতে আঁচ করতেই পারবে না। বনগাঁ পৌঁছে ইছামতী পেরিয়ে বাগদা-বয়ড়া রুট ধরে হেঁটে চলছি মণিগ্রাম-মাধবপুরের দিকে। আরিব্বাস, একি দেখি! কি সুন্দর সুন্দর এসিওলা বাড়ি — কোনটা দুতলা, কোনটা তিনতলা। কিন্তু এক তলাটা অমন বন্ধ মতোন কেন? জানলা নেই, শুধু একটা সাটার ফেলা দরজা। আর একতলাটা বেশ উঁচুও বটে — একটা ট্রাক ঢুকে যেতে পারে ভেতরে। ফ্রাস্টু বুঝিয়ে দিল যে এগুলো গুদাম — পাট তুলে এনে এখানে মজুত করে ছোট-বড় নানা আড়তদাররা। তাই ভাবি, যে বনগাঁয় ব্যাঙ্ক ছাড়া কোনো সার্ভিস সেক্টর নেই, সেখানে এমন 'শিল্প কর্ম' করলো কে? বাড়িতে গুদাম তৈরির জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমতি লাগে না?

আর একটু এগোতেই পেয়ে গেলুম আমার প্রার্থিত একটা জায়গা: মোটেল কাম বার। মাল খাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় মনটা আঁকুপাকু করে উঠলো, কিন্তু বাগড়া দিলো ঐ চাষাভুষোরা। ফ্রাস্টু দেখি এক গায়ে হাজা পড়া চাষার সঙ্গে কথা কইছে। "The Jute Corporation of India (JCI)-র মতো সরকারি সংস্থাকে কাঁচা পাট না বেচে সে ব্যাটা কেন এইসব 'লাইসেন্সড' আড়তদারদের পাট বেচেছে? জেসি আই যে 'ন্যায্য মূল্য' দেয়, তা কি এইসব 'লাইসেন্সড' আড়তদাররা দেবে? চাষি ব্যাটা কাঁচুমাচু মুখ করে বলে, "বাবু, আমাদের তো *সরু লাইন* জানা নেই। আমাদের পাট সাইকেল-ফড়েরা নিয়ে গিয়ে বেচে দেয় এইসব ছোট বড় আড়তদারদের কাছে। ওদের জেসিআই-এর সঙ্গে সরু লাইন আছে।"

ওর কথা থেকে 'সরু লাইন' ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারিনি কিন্তু, পাটের আড়তদার বনগাঁবাসী রামাবতার আমাদের সেটা বেশ ভালো করে বুঝিয়ে দিলেন। প্রায় ১০০০ হাজার হেক্টর জমিতে দু'রকম পাটবীজ কিনে সম্বচ্ছর পাট চাষ করে প্রায় ১০,২০০ হাজার বেল পাট উৎপন্ন করে প্রায় ২০ লাখ পরিবারের ৩০/৪০ লাখ ছোট ও প্রান্তিক চাষীরা। এখানে কোনো পণ্য-উৎপাদক বুর্জোয়া চাষী নেই, বরং যেন অনেক কৃষকই ভূমিহীন হয়ে শ্রমিকশ্রেনির মধ্যেই যেন ঢুকে পড়েছে। এত কাঁচাপাট একা জেসিআই সামলাবে কি করে? তাই স্রেফ পরোপকারের ইচ্ছে থেকেই এই রামাবতারের মতো ধার্মিক মানুষরা চাষীদের কাছ থেকে মনের হিসেবে পাট কিনে নেন এবং গুদামে এনে সেগুলোর কোয়ালিটি অনুযায়ী ঝাড়াই বাছাই করেন এবং জেসিআই-এর 'অনুমতি সাপেক্ষে' সেগুলো চটকল মালিকদের বেচে দেন। জেসিআই-এর কাজ কমাতে গিয়ে রামাবতারের বেশ খরচা আছে। গড়ে ১২ টা. ৬৬ পয়সা খরচা আছে প্রতি বেল পেছু পাট যাচাই করান, প্যাকিং এর খরচা বেল পেছু ৮.৭২ টা, গাড়িতে লোডিং এর জন্য খরচা বেল পেছু ৩.৩৬ টাকা। আবার ১৫ টা. করে কুইন্টাল পেছু 'দালালি' দিতে হয় (কাকে সেটা পাঠক অনুমান করে নেবেন), ১৫ টাকার ক্লেম দিতে হয় কাকে যেন। এবার গাড়ি খরচা করে কোলকাতায় যখন কাঁচা পাট পৌঁছয়, তখন প্রতি ৬০ বেলে ৭৫ কিলো কমিয়ে নেয় চটকল মালিক। তৎক্ষণাৎ চালানে ৪০ শতাংশ টাকা পেয়ে গেলেও আরো তিনমাস অপেক্ষা করতে হয় ফুল পেমেন্টের জন্য। এবার ব্যাঙ্ক লোনের সুদ মিটিয়েও রামাবতারের ঘাটতি থেকে যায় বেল পেছু প্রায় ৩০ টাকার, তার ওপর ৪০ টাকা বেল পেছু সুদ গুণতে হয়। কেননা একবার বেল, একবার কুইন্টালে হিসেব দেওয়া হচ্ছে এসব কথা শুনে আমার মাথা গোলানোর অবস্থা, এসময়ই 'আসলি' খাতা খুলে রামাবতার দেখিয়ে দেন যে গতবছর পাট কিনে মিলে সরবরাহ করতে গিয়ে তাঁর ৫০ লাখ টাকার ক্ষতি হয়ে গেছে।

এ শুনে তো আমার হার্টফেল করার অবস্থা। ফ্রাস্টু ব্যাটা দেখি কিন্তু মিটিমিটি হাসছে। ফ্রাস্টু বলে, "আপনার এই ক্ষতি নিয়ে আমরা কেন যে ভাবি না মশাই, কে জানে! আমরা চশমা-নাকে-আঁটা বাবুরা কেবল ঐ কোমর জলে দাঁড়িয়ে থাকা কষ্টই দেখি আর দেখে জেসিআই-নিয়োজিত আনঅফিসিয়াল তদারককারি। বিশ ত্রিশ দিন জলে দাঁড়িয়ে ব্যাটাদের পাটের retting, stripping, washing করতে হয়। গা হেজে যায়, দাদ-হাজা-চুলকানি-ম্যালেরিয়ায় ভোগে — এসব আপনার ঐ ৫০ লাখ টাকা লসের কাছে তুশ্চু। ভাগ্যিস, জেসিআই পুরো কাঁচা পাটটা চাষিদের কাছ থেকে কেনে না।"

— "না না, জেসিআই তো কিনবেই। আমি নিমিত্ত মাত্র।" এই বলে রামাবতার গুদাম-আপিসের দেয়ালে টাঙানো বজরঙ্গবলির ছবিকে নমো করেন। আমি আমার একটা খটকা রামাবতারের কাছে ক্লিয়ার করে নিতে চাইছিলুম — রামাবতার একবার কুইন্টাল, একবার বেল আর একবার কেজিতে মালের হিসেব নিকেশ দিচ্ছেন কেন? এর পাটী গণিত কি? ফ্রাস্টু আমায় টিপে দেয়, থামিয়ে দেয় এবং তারপর গুদাম দেখতে বেরোয়। আমার কিন্তু আপিস ঘরটা বেশ ভালো লেগেছিলো — ঠিক মগনলাল মেঘরাজের ঘরের মতো। গদির পেছনের দেওয়ালটা ঠাকুর দেবতার ছবিতে ভরা, কিন্তু একটা জায়গায় স্পষ্ট করে স্লেটের ওপর খড়ি দিয়ে মজুত মাল, চালান মালের হিসেব লেখা আছে। পুরো ব্যাপারটা দিনের আলোর মতো "স্পষ্ট"।

এবার 'সরু লাইন' যে কত সরু তা গুদামে গিয়ে বোঝা গেল। রামাবতার আটরকমের তোষা পাটের নমুনা আমাদের দেখিয়ে চিনিয়ে দিলেন চটপট: TD-1 থেকে TD-8। TD-1 ও TD-2 এখানে হয় না, হয় বসিরহাটে। আর ভালো সোনালি পাট মেলে বাংলাদেশে। ওপারেই তো পাটের চাষ হতো। দেশভাগের ফলে পাটের জমি ওপারে, আর পাটকল এপারে। তা বিধান রায়ের আমলে এখানে চেষ্টা চরিত্তির করে পাটের চাষ বাড়ানো গেছে বটে, কিন্তু কোয়ালিটি পাট এখনো বাংলাদেশেই উৎপন্ন হয়: W-1 থেকে W-8 পর্যন্ত যার রকমফের। BSF কে জলপানি দিলে সেটাও রামাবতারের কাছে মিলবে। এছাড়াও 'মেস্তা' নামের একধরনের বীজের বিক্রি-বাটা আছে। সেটা পাট নয়, পাটের "মতো"।

এবার আমাদের ওজন দেখার পালা। যে পাল্লায় পাট চাপানো হল, তাতে ২ কিলো ওজনের বাটখারা। কেন? প্রশ্ন করতে নেই। পাল্লার অন্যদিকে ১০০ আর ৫০ কেজির দুটো বাটখারা। মানে ১৪৮ কেজি থুড়ি ১৫০ কেজি = ১ বেল? এবার আমি প্রশ্ন না করে আর পারলুম না: "দাদা, আমি তো জানি ১৮০ কেজি = ১ বেল, ১৪৮ কেজি মানে...?" রামাবতার একটুও না ঘাবড়ে জবাব দেয়, "পাটের কত ছাঁট বাদ যাবে তার ঠিক নেই। কোলকাতায় ৬০ বেলে ৭৫ কিলো বাদ যাবে। ২ কেজি পড়তা ধরে নিয়েছি তাই। আর ১৮০ কেজির হিসেব চলে বাংলাদেশে — হাইড্রোলিক মাপ। ওসব আমাদের এখানে চলবে না।" তার পরপরই উনি অবশ্য গুদামের পাটের ধুলো কুড়িয়ে নিয়ে বল্লেন, "দেখুন মশাই, এই ধুলোও আমি বেচবো। পাটের কিস্‌সু ফেলা যায় না। প্যাঁকাটি থেকে পাটশাক এবং এই ধুলো — সবই বেচা যায়!"

চাষাভুষোরা এতশত হিসেব বুঝবেন কি করে? আর সরকারের উৎপাদনের হিসেব

নিকেশেও এই 'গরমিল' প্রতিফলিত হয় না, অথচ 'অর্থনীতির শিক্ষক' গড়গড় করে পাটজাত দ্রব্যের ও পাটের গড় উৎপাদন দেখিয়ে দেন। পাটজাত দ্রব্যের গড় উৎপাদন: বাৎসরিক ১৬০৫ টনস্; গড় বার্ষিক রপ্তানি: ৬০৮৯ মিলিয়ন টাকা। গড় অভ্যন্তরীণ চাহিদা: ১৪২২ টনস্। এই জায়গায় এসে আমি আবার চমকালুম, রপ্তানির হিসেব দেওয়া হচ্ছে টাকার হিসেবে আর অভ্যন্তরীণ চাহিদার হিসেব (বিক্রির নয়) দেওয়া হচ্ছে টনস্-এ — কেন? চাষি বেচেছেন কাঁচাপাট ১০ মন ৪ হাজার টাকায়। গুদামে আবার বেলের অদ্ভুত হিসেব। বারবার টন-কেজি-কুইন্টাল-বেল-মন এবং টাকার হিসেব গুলিয়ে দিয়ে কোনো কিছুকে কি লুকোনো হচ্ছে? চাষি তো বেলের হিসেব জানে না। তার এই অজ্ঞানতার কারণ কি? আবার জেসিআই যে বেলের হিসেব জানে, রামাবতার সে হিসেব জেনেও জানে না। ব্যাপারটা কি? চাষার মন, আড়তদারের কেজি-কুইন্টাল-বেল-এর কনভারশান কিভাবে হয়? এরকম হিসেব থেকে গোদা দেশজ উৎপন্নের (GDP) হিসেব কষা হবে কি করে? এবার 'বাস্তব' জাতীয় আয়ের বাস্তবতা বুঝবো কি করে? 'বাস্তবতা' বোঝার আত্যন্তিক প্রয়াসই বা চালানো কেন? এই সব সাতপাঁচ কথা আমার MIT-ফেরৎ অর্থমন্ত্রী থাকতে চিন্তা কি! ফ্রাস্টু গুদাম থেকে বেরিয়ে মাধবপুরের দিকে হাঁটতে হাঁটতে বলতে লাগলো, "এবার বুঝলি কি ছায়া-খেলার সরু লাইন? অভ্যন্তরীণ বাজারের টাকার হিসেব — মোট কাঁচাপাট উৎপাদন বা পাটজাত দ্রব্যের মোট উৎপাদনের হিসেব — তুই জম্মেও পাবি না। সম্ভাব্যতার সূত্রের পরিসংখ্যানী আঁক এখানে ফেল মেরে যাবে, বিদ্যে-ব্যবসায়ীর will to record-ও এখানে আর্কাইভ তৈরি করতে পারবেনা। কেননা এই খেলা-২ গোদা অর্থে (অ-দেরিদীয়) 'অলিখিত' পরিসর। দেশের বাজারে বিক্রির হিসেব ইচ্ছে করে চেপে যাওয়া হয়। আবার ধর, তুই পরপর তিনবছর গুদামজাত মজুত পাটের হিসেব-নিকেশ করলি। দেখা গেল '৯২-৯৩-এ আছে ৩২ লক্ষ বেল ('বেল' মানে কত কেজি সেটা মাথায় রাখিস), '৯৩-৯৪ সালে ২৫ লক্ষ বেল, '৯৪-৯৫ সালে ১০ লক্ষ বেল। অন্তিমে প্রশ্ন তোল, বাকি কাঁচা পাট গেল কই? বেপথে রপ্তানি হয়ে গেছে, নাকি ফলন হয় নি অন্য বছরগুলোয়? নাকি সেগুলো মাল উৎপাদনে কাজে লেগে গেছে? নাকি পাটকলের মালিক ফাঁকা গুদামে আগুন ধরিয়ে দিয়ে বীমা কোম্পানির কাছ থেকে টাকা বাগিয়েছে? তবে এই হিসেব থেকেই অনুমান করা যায় যে পাটের চাহিদা প্রচুর। আর এসব হিসেব নিকেশে তোর যত মাথা গোলাবে, তত লো-পাট হবে বেচা কেনা সংক্রান্ত তথ্য ও অঙ্ক; সরকারকে প্রদেয় কর; শুল্কের প্রতিটি স্তরে পাওয়া যাবে ছাড়। মনে রাখিস খেলা-২-এ ক্ষতি দেখালে খেলা-১-এ লাভ বেশি।" এই বলেই সত্যের হাঁচি হাঁচতে শুরু করে ফ্রাস্টু, আমারও নাক সুড়সুড় করছে।

এতক্ষণ গুদামে থাকার ফল।

হাঁচতে হাঁচতেই ফ্রাস্টু বলে, "ভেবে দেখ তাহলে এবার ফ্যাক্টরিতে এ্যাসবেস্টস বা টিনের চালের নিচে যে শ্রমিকরা কাজ করেন তাঁদের কি অবস্থা। কাঁচের শার্সি দেওয়া জানলা। ফ্যাক্টরির ধুলো পরিস্কারের জন্য যে গয়দারা ছিলেন, তাঁরা আজ ছাঁটাই হয়ে গেছেন। ধুলোও পরিষ্কার হয় না। পাটের সোনালি তন্তু ফর্ ফর্ করে ওড়ে। নাকে-মুখে ঢুকে তা পেট ও ফুসফুসে ঢোকে। নিউমোকোনিওসিস জাতীয় রোগের অন্যতম একটা অসুখে তাঁরা ভোগেন, যে কোনো টেক্সটাইল কর্মীই এই রোগের শিকার: Byssinosis। আর যে সব মিস্ত্রি চটকল আধুনিকীকরণের নামে পুরোনো যন্তর সাফসুতরো করে রঙচঙ করেন, তাঁদের নাকে মুখে ঢোকে ক্রাশড্ আয়রনের ধুলো। তাঁদের যে রোগটা হয়, তার নাম Siderosis। ফুসফুসের রোগ সব। ঐ সব মিস্ত্রি সাফাই-এর পরের দিন আর কাজে আসতে পারেন না — কেলিয়ে পড়েন। পুরোনো শ্রমিকরা তাই দৈনিক দুটো করে কলা খাওয়ার দাওয়াই দেন বটে, কিন্তু তাতে কেবল প্লাসিবো এফেক্ট ছাড়া আর কিছু হয় না, ঐ মানসিক শান্তি আর কি! হ্যাঁ যা বলছিলুম, এই হিসেবের গরমিলের কথা। রামাবতার কেমন উদ্যোগপতি দেখেছিস? বাংলাদেশ থেকে কাঁচাপাটই আনছে 'স্মাগল' করে কিন্তু সুতলি হিসেবে। এই সুতলি বা Yarn-এর বিদেশী বাজার এখন খুব ভালো। আবার দেখ সরকারি স্বনির্ভর প্রকল্পের টাকা নিয়ে মেয়েদের দিয়ে কেমন পাটের শন দিয়ে বিনুনি বানাচ্ছেন! কেন জানিস? আমাদের দেশের মধ্যেই, তুই কাঁচা পাট কেরলে পাঠাতে পারবি না, তাই পাটজাত দ্রব্য 'হস্তশিল্প' হয়ে কেরালায় পৌঁছে যাচ্ছে, সেখান থেকে জাহাজে চড়ে ভিনদেশে সে পাড়ি দেবে। এবার ঠেলা বোঝ। রপ্তানির এবং কাঁচাপাটের মজুতের হিসেব বের কর। গোদা জাতীয় উৎপন্নের (GNP) হিসেবে দেখা দেখি! নে শালা, এবার আঁক কষ।"

আমার সন্দেহ হয়, রামাবতার খুল্লাম খুল্লা এতশত কথা আমাদের বলে দিল কেন? ফ্রাস্টু হেসে ফেলে বলে কিনা যে রামাবতার আমাদের গুণতির মধ্যেই আনেননি — ঐ চাষাভুষো কুলি-কামিনদের মতোই আমাদের ধর্তব্যের মধ্যেই আনেন নি। আমরা আর কোথায় গিয়ে লাগাবো এসব কথা? বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে? আমাদের উনি বাল-জ্ঞান করেছেন, তাই সব বলে দিয়েছেন। ফ্রাস্টুর এমন কথা শুনে আমার আঁতে বেশ ঘা লাগলো এবং ফের এইভাবে বড়লোক হবার ইচ্ছে চাগিয়ে উঠলো। চাষাভুষো শ্রমিকদের জন্য আমার কোনো পরচিকীর্ষার ব্যাপার নেই। পরচিকীর্ষার চেয়ে বৈজ্ঞানিক জিজ্ঞাসা থেকে বিজিগীষায়

যাওয়া ঐতিহাসিক ভাবে 'ভালো', 'উন্নত', 'প্রগত' ... মন, তোমার এ ভ্রমণে ভ্রম গেল না? তবে মিছে ভ্রম কেন অকারণে? ভ্রম ভ্রম — সব ভ্রম, তথাপি এখনো আমি সরকারি পরিসংখ্যানকে সম্ভ্রম করি। 'অর্থনীতির শিক্ষক'ও করেন। অর্থমন্ত্রী আর অর্থনীতির শিক্ষক এক হয়ে গেলে তো সোনায় সোহাগা — এক্কারে দার্শনিক রাজা!

এই সময়ে ফ্রাস্টু দেখি হঠাৎ একজন 'অবহেলিত' বৈজ্ঞানিকের খোঁজ করছে: গৌতম গুণানন্দ বাঁড়ুজ্জে। এই বৈজ্ঞানিক ভদ্দরলোক নাকি এমন এক বায়োটেকনিক বার করেছেন, যাতে কাঁচাপাট আপনি পচবে — চাষাদের আর ২০/৩০ দিন কোমরজলে দাঁড়িয়ে কষ্ট পেতে হবে না। বনগাঁর ক্ষেতে চাষাদের দেখে ওর এমন কষ্ট হয়েছে যে তক্ষুনি চটপট এই বৈজ্ঞানিককে, এই বনগাঁ থেকেই ও খুঁজে বের করবে। ফ্রাস্টু বড়ো বেশি ইম্পাল্সিভ — এক্ষুনি যেন চাষাদের সমস্যার সমাধান করে দেবে।

৩. মালিক: অবয়বহীন/অশরীরী!

না, ফ্রাস্টুর সঙ্গে ঘুরলে আমার বড়লোক হওয়ার সদিচ্ছে মাঠে মারা যাবে। তার চেয়ে বরং চাষাভুষো আর শ্রমিক মিস্ত্রিদের মতো বাড়তিদের দিকে না তাকিয়ে এবার মালিকদের দিকে একবার তাকানো যাক — এইসব উদ্যোগপতিরা কি উপায়ে রুগ্ন চটলকল চালিয়ে নিজেদের আত্যন্তিক 'ক্ষতি' করিতেছেন, তাহা আমাকে জানিতেই হইবে।

১৮৫৪-তে মুম্বাইতে যদি সূতিবস্ত্র কারখানা শুরু হয়, তাহলে ১৮৫৫-র কোলকাতায় শুরু হল পাটকল খোলার কারবার — স্কট-শিল্পপতিদের উদ্যোগে। তার আগে থাকতেই তাঁদের দেশের ডান্ডিতে ছিল পাটকল। সেখানে এখান থেকেই যেতো কাঁচামাল; এমন কি হস্তশিল্পী তাঁতিরা যে পট্টবস্ত্র বা চট বানাতো, তা আমাদের দেশের হিঁদুদের পুজো-আচ্চায় যেমন লাগতো, তেমনি যেতো বিদেশে কিন্তু সাহেবরা দেখলেন কোলকাতার আশপাশেই যদি কাঁচাপাট তৈরির পশ্চাদভূমি থাকে, তাহলে মাল সরবরাহের খরচা বাঁচিয়ে এই পোড়া শহরেরই আশপাশে খোলা ভালো।

এবং তারপর শুধু কল বেড়ে চলার ইতিহাস। ১৮৭৯-৮০ তে ২২টা চটকল ১৯১১-য় গিয়ে দাঁড়ালো ৬১। বলা বাহুল্য যে লুম ও স্পিন্ডলের সংখ্যাও পর্যায়ক্রমে বেড়েছে। এতে যে আমাদের হস্তশিল্পী তাঁতিদের ভাত মারা যাবে, তাতে আর সন্দেহ কি!

কিন্তু এই শিল্পের জোয়ারকে অন্যভাবে পড়লেন আমাদের জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকরা: তাঁরা এটাকে দেখলেন 'শিল্পায়ন' হিসেবে নয়, 'অবশিল্পায়ন' হিসেবে। ধুস্! আরো বড়ো 'industry' গড়া আর ছোট হস্তশিল্পের এন্তেকালকে কি কেউ deindustrialization বলে? তাহলে তো ধরে নিতে হয়, "আমাদেরও" 'industry' ছিল, সেকথা আমরা ভুলিয়া গেছি। পাটকলের ক্রমবর্ধমান সংখ্যাধিক্য কেমন শিল্পায়নের (ও তৎসহ দূষণের) বাতাবরণ তৈরি করিতেছে — তাহা না দেখিয়া অবশিল্পায়নের ধুয়ো তুলিলেই হল?[৫]

সাহেব মালিকরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই মিল চালাতেন 'ম্যানেজিং এজেন্সি' মারফৎ। দেশী সদাগর আর বিদেশী শিল্পপতি মিলেজুলে এই ম্যানেজিং এজেন্সি এক দুর্দান্ত ব্যবস্থা। আমেদাবাদের সূতীবস্ত্রের কলে এঁদের আধিপত্য থাকলেও মুম্বাইতে এই এজেন্সির ব্যাপারটা ছিল নামমাত্র, কিন্তু কোলকাতায় এই এজেন্সির দাপট দেখবার মতো। একটা প্রা. লি. কোম্পানি তার শেয়ার বেচা, ব্যাঙ্ক ঋণ বা সরকারি অনুদান পাওয়ার ক্ষেত্রে এই ম্যানেজিং এজেন্সির দ্বারস্থ হত। তাতে অনেক সুবিধেও পাওয়া যেত। কেননা ম্যানেজিং এজেন্সি তার 'গুড উইল' দর্শিয়ে এইসব লেনদেনের কাজ করে ফেলতো, বিভিন্ন ধরনের শিল্প-ব্যবসার সংযুক্তিকরণ ঘটাতো এবং শেয়ার হোল্ডারদের প্রাপ্য অংশ থেকে একটা বড়ো মাপের টাকা দস্তুরি বাবদ ঝেড়ে নিতো। পাটকল পরিচালনায় এন্ড্রু ইউল বা বিড়লার এজেন্সি অত্যন্ত 'গুরুত্বপূর্ণ' ভূমিকা নিয়েছে এককালে, বিশেষত প্রথম মহাযুদ্ধ পরবর্তী আক্রার সময়ে এঁদের মতো 'অনুৎপাদক' পারিবারিক জাত বেনেদের রমরমা অবস্থা হয়। যদিচ ঐতিহাসিকরা বলেন, এই সাবেকি বংশানুক্রমিক জাত বেনেদের মাইন্ডসেট য়ুরোপীয় মানদণ্ড অনুযায়ী প্রাক্-শিল্পবিপ্লবী অর্থাৎ নবীন শিল্প-উদ্যোগে এঁদের মন নেই, কেবল এজেন্সি মারফৎ (দালালি করে?) ট্রেডিং করে

[৫] সচরাচর যাকে 'কুটীর'/'হস্ত'/'লোক'শিল্প ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়, সেই শিল্পের অবনতি বোঝাতে এই 'অবশিল্পায়ন' (Deindustrialization) শব্দটি ব্যবহার করেছেন রমেশচন্দ্র দত্ত (১৯০৪); মদনমোহন মালব্য (১৯১৮) প্রমুখ জাতীয়তাবাদী অর্থনীতিবিদ্ তথা ঐতিহাসিকরা। ইন্ডাস্ট্রির আগমনে স্রেফ শিল্পের (এর সঙ্গে তাঁরা 'কুটীর-', 'হস্ত-' বা 'লোক-' এর মত শব্দ prefixed করেন নি) অবনতি — অবশিল্পায়ন: 'আমাদের' শিল্পের এন্তেকাল। কৃষি ও হস্তশিল্পের যৌথ অবস্থান, যা মার্ক্স স্বয়ং লক্ষ করেছিলেন এ দেশে, তা ভেঙে চুরমার করে নবীন ইন্ডাস্ট্রি। এখানকার কাঁচামাল ম্যাঞ্চেস্টারকে সমৃদ্ধ করতে শুরু করে, রপ্তানি কমতে থাকে ভারতীয় শিল্পজাত পণ্যের এবং আমদানি প্রবর্ধিত হতে থাকে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে। এই যে সম্পদের স্থানান্তর ঘটছে, তাকে জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকরা বলেন 'সম্পদের অপনয়' (Drain of Wealth)।

ফায়দা তুলতে চান।

কিন্তু এমন সুন্দর অনুৎপাদক এজেন্সি ব্যবস্থার বা ব্যবসার ওপর থাবা বসায় কল্যাণকামী বিদেশী সরকার। ১৯১৩-র কোম্পানি আইন ও ১৯৩৬-এর সংশোধনী আইন এমন ব্যবস্থা করলে যে কোম্পানির ডিরেক্টরস্ নির্ধারণে এঁদের ভূমিকা শূন্য হয়ে গেল, শেয়ার হোল্ডারদের থেকে দস্তুরি ঝাড়ারও কোনো উপায় রইলো না। 'স্বাধীন' ভারতে, ১৯৫৬ সালে, কোম্পানি আইন মোতাবেক এঁদের 'বিলুপ্ত' করার 'চক্রান্ত' হয়েছে।

কিন্তু জাত বেনের এজেন্সি-'জিন'এর সেলফিশ পেত্নি কি আইন দ্বারা বিলুপ্ত করা যায়? পাট শিল্পে আজ অব্দি দু'নম্বরী ছায়া-খেলায় 'এজেন্সি' দাপটে রাজত্ব করছে। এবং মহামান্য আদালত এ ব্যাপারে নিদারুণ সাহায্য করে চলছেন। গত শতকের আট ও নয়ের দশকে যখন পাটকলগুলো নবোদ্ভুত পলিমারের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে ধুঁকতে শুরু করেছে, দেখা দিচ্ছে তরলীকরণের সংকট, শ্রমিকদের বকেয়া টাকা মেটাতে ব্যর্থ হচ্ছে, তখন কোর্টের নির্দেশে কাঁচাপাট সরবরাহকারী ও পাওনাদারদের হাতে তুলে দেওয়া হয় বেশির ভাগ চটকল। তাঁরা মাসিক ৬ থেকে ১২ লাখ টাকা ভাড়া মালিককে দিয়ে মিল চালাবেন। পোদ্দার-ওসওয়াল-সারদা-কাংকারিয়ারা এবার এসে গেলেন আস্তে আস্তে ধীরে সুস্থে। এঁরা আর 'এজেন্সি' নন এখন, মিলের 'লাইসেন্সি' — একাধিক চটকলের 'লাইসেন্সি'। ১৯৮৫-তে আদিত্য ট্রান্সলিংক শ্যামনগরের জুট কোম্পানির লাইসেন্সি হন তো, ১৯৯৫-তে RBD টেক্সটাইল হয়ে যায় ভিক্টোরিয়ার লাইসেন্সি বা ভাড়াটে মালিক। লীজ/সাবলীজে কে কখন কোন কারখানার মালিক হচ্ছে বা হচ্ছে না — সেটা কেউ জানে না। এখন কে কোন এজেন্সি কোন চটকলের ভাড়াটে মালিক হয়ে নিজের তুতো ভাই-বোনেদের নিয়ে বোর্ড অব্ ডিরেক্টরস্ তৈরি করছেন, কিভাব ব্যাঙ্কের খাতা 'ম্যানেজ' করছেন, তা ভগা ছাড়া আর কেউ জানে না। এমন কী কোর্টও জানে না। যদিচ ইন্টারনেট হাতড়ে দেখলুম, পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান ৫৯ টি চটকলের কয়েকটি বাদে (৩২ টি 'ব্যক্তিগত' মালিকানাধীন, লীজ/সাবলীজে আছে ২১ টি প্রা. লি. কোম্পানি, আর সরকারি NMJC-র অধীনে ৬টি) প্রত্যেকটির মালিকের নাম-ঠিকানা-ফোন নাম্বার-ফ্যাক্স সুন্দর করে দেওয়া আছে, তবে সংকটের সময় মালিককে কেন খুঁজে পায় না সরকার, পুলিশ বা আদালত? কয়েকটারই বা মালিকের প্রপার নেম নেই কেন?

এরকম একটা গভীর সংকটের কথা বলি, তাহলে হয়তো মালিকানার সংকটটা বুঝতে পারবেন পাঠক। ঘটনাটা ঘটেছিলো, বরানগর জুটমিলে ১৩ই জানুয়ারি ২০০১-এ। এমন

মারাত্মক শ্রমিক অসন্তোষ ঘটেছিলো যে খোদ কমরেড জ্যোতি বসু মন্তব্য করেছিলেন, "সাংঘাতিক ঘটনা, আমার ২৪ বছরে ঘটে নি। তবে মুম্বাইতে এরকম ঘটনা কতই তো ঘটে।" (আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৫/০১/০১)। আর একজন কম্যুনিস্ট নেতা কাম মন্ত্রী বলে ফেললেন দুঃ-'ভাগ্য'-জনক এবং অবশ্যই পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে "বিচ্ছিন্ন ঘটনা"। তবে এঘটনার বর্ণনা আমার মতো অভাজন যে ভাষায় প্রকাশ করতে পারবে তা নয়, যদি কেউ পারেন তো তিনি হলেন গিয়ে *জার্মিনাল* উপন্যাসের লেখক। এটাই ব্যাপার, অর্থনীতি-ইতিহাসের পঞ্জিকায় যা লেখা যায় না, সাহিত্যিক বা ফিলিম করিয়ে-রা তা' অনায়াসে বলে ফেলেন। সাধে কি আর আমি এই প্রতিবেদন লেখার সময় বারংবার 'গুরু'র দু'নম্বরী সিডি চালিয়ে দেখছি।

ঘটনাটা বলার আগে শ্রমিক অসন্তোষের কারণগুলো একটু বলে নিই। নাগরিক মঞ্চের কল্যাণে আপনারা সবাই জানেন যে এই সব ম্যানেজিং এজেন্সি থুড়ি প্রা. লি. কোম্পানিগুলো দীর্ঘদিন ধরে শ্রমিকদের প্রাপ্য টাকাপয়সা চোটপাট লোপাট করে দিচ্ছে। যেমন, এই মুহূর্তে শ্রমিকদের PF বাবদ বকেয়া প্রায় ২৫০ কোটি টাকা, ESI বাবদ পাওনা প্রায় ৭৫ কোটি টাকা, গ্র্যাচুইটি বাবদ প্রায় ৪০০ কোটি টাকা বকেয়া। এছাড়া আরও আছে, ১৯৮৫ তে কেন্দ্রীয় সরকারের আধুনিকীকরণ বাবদ দেওয়া ৩০০ কোটি টাকার হিসেব নেই। ১৯৮৯-৯০-তে রুগ্নতার অজুহাতে ৩৩টি চটকল ৩৩ কোটি টাকা পেয়েছিলো। কুজনে দুর্জনে বলে থাকেন, ১৯৯১-২০০১-এ ব্যাঙ্কের পুঁজি কারখানায় লগ্নি করার নামে "হাতিয়ে নিয়েছে" মালিকরা প্রায় ১,৩৩,৮০৪ কোটি টাকা। এসব যে শ্রমিকদের কানে পৌঁছয় না ত নয়। তারা ক্ষুব্ধ হয়, রেগে যায়, ইউনিয়নের ন্যাতাদের নির্দেশে রেল রোকো, ধর্মঘট করে, প্রতিবাদ করে। কিন্তু, সেদিন, ১৩/০১/০১-এ তারা যেটা করলো, তা 'নজির বিহীন'। ঐ অপয়া তেরো তারিখে তারা মিলের সব দরজা বন্ধ করে দেয়। ম্যানেজারদের ঘিরে ধরে। এ অবস্থায় মিলের চিফ এক্সিকিউটিভ জগদম্বা তেওয়ারির নিজস্ব রিভলভার থেকে গুলি ছোঁড়া ছাড়া আর কিছুই করার ছিল না। গুলি লাগে ভোলা দাস বলে একজন জুট শ্রমিকের গায়ে। রক্ত মাথায় ওঠে শ্রমিকদের। তারা জগদম্বা তেওয়ারির আর পারসোনেল ম্যানেজার গৌতম ঘোষের গায়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। ওঁরা মরে যান। মারাত্মক আহত হন ম্যানেজার মনোরঞ্জন সরকার। জগদম্বার রিভলভার আর খুঁজে পাওয়া যায়নি।

শ্রমিকরা সবক্ শেখাতে গেছিল চাকুরে ম্যানেজারদের? সেকি কথা! মালিককে নয় কেন? ১৯/০১/০১-এ আনন্দবাজার পত্রিকায় লেখা হচ্ছে,

(মিলের) মালিকানার কোনো কাগজপত্র পাওয়া যাচ্ছে না। ... *কাগজে কলমে গোবিন্দ সারদা ঐ মিলের মালিক নয়।*[৪]

মালিককে খুঁজে পাওয়া যায় না বলে ম্যানেজারের মতো মনিবের চাকরের ওপর হামলা হয়। এই তো সেদিনও, ১/৮/০৭-এ আক্রান্ত হলেন হুগলি জুটমিলের পারসোনেল ম্যানেজার শান্তিচন্দ্র চৌধুরি। 'আসল' লোককে পাবি না তো তবে সব ব্যাটাকে ছেড়ে বেঁড়ে ব্যাটাকে ধর?

মালিক (?) এই বেঁড়ে ব্যাটাকে দিয়ে সব "করিয়ে" নেন আর ঝাড় খায় বেঁড়ে ব্যাটা। ফ্রাস্টু বলছিলো তার সেই অ্যাওয়ার্ড পাওয়ার অভিজ্ঞতার কথা। মানব সম্পদ উন্নয়নের যে বিভাগে ও ফেলোশিপ পেয়েছিলো (এই ফেলোশিপ রাম গাঁধির মতো মানুষও পেয়েছেন),

---

[৪] "কাগজে কলমে গোবিন্দ সারদা ঐ মিলের মালিক নয়।" — এমন বচনের তর্কশাস্ত্রী ব্যাখ্যা কি হতে পারে? কোনো প্রপার নেমের ক্ষেত্রে নেতিবাচক বিধেয় আরোপ হলে কি হয়? যিনি মিলের মালিক নন, তাঁর প্রপার নেম ব্যবহার করে নেতিবাচক বিধেয় দেওয়ার মানে কি? 'রাম/রহিম/গোবিন্দ সারদা/ হিজ্‌বিজবিজ/বন্ধ্যাপুত্র/ইউনিকর্ন/X ঐ মিলের মালিক নন।' এমত বচনের প্রথম দুটি বিকল্প-নাম অজ্ঞাত পরিচয়, গোবিন্দ সারদা-পরবর্তী তিনটি নাম একটি Fictional ও অন্য দুটি রাসেলীয় পরিভাষায় Empty Terms এবং শেষটি একটি চল বা variable। সাতটি নামের পাশে নেতিবাচক বিধেয় প্রয়োগ একই ফলাফল দেবে না, যেমন 'ইউনিকর্ণ' বা 'বন্ধ্যাপুত্র' এর মূল্য শূন্য; তার সঙ্গে ইতি বা নেতিবাচক যে বিধেয়ই প্রযুক্ত হোক না কেন বাক্যের সত্যমূল্য ইতি-নেতি দু ক্ষেত্রেই শূন্য হবে। যথা "ফ্রান্সের রাজার মাথায় টাক আছে/নেই।" বচনে ফ্রান্সের রাজা = 0 বা কেউ না হওয়াও পরবর্তী ইতি-নেতির কোনো সত্যমূল্য থাকছে না।

গোবিন্দ সারদাকে যদি তর্কের খাতিরে এমন Empty term হিসেবে ধরে নিই, তাহলে তাঁর সম্পর্কে প্রযুক্ত ইতি-নেতির কোনো সত্যমূল্য থাকে না। এবার বুর্জোয়া-সেটের (B) অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তি হিসেবে যদি গোবিন্দ বাবুকে (G) ধরা যায় ($G \varepsilon B$) এবং G যদি একই সঙ্গে অবয়বহীন (মিলমালিক হিসেবে) ও অবয়বধারী (পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতিচর্চায়, বিশেষত নন্দন-প্রকল্পে তাঁর অব-'দান' সুপ্রচুর — অবিশ্বস্ত সুজনের কাছ থেকে প্রাপ্ত খবর) হন, তাহলে B সেটটি একই সঙ্গে ব্রহ্মসম তুরীয় X ও non-X এর সহাবস্থান হয়ে ওঠে। এই তুরীয় অবয়বহীনতার বা ফাঁপা শব্দের তর-তম প্রবর্ধন ঘটতে থাকলে B থাকবে অথচ থাকবে না। মিল অথবা নন্দন-সংস্কৃতিচর্চার অর্থনীতিতে তিনি আছেনও বটে, নেইও বটে। কিন্তু যেটা বলবার কথা, সেটা হল সংস্কৃতিচর্চাতেও উদ্বৃত্ত শ্রমের বেশ খানিকটা অংশ চলে যায়, অ্যাকাদেমিকস-এও যায়! এটা B-এর পক্ষে কাম্য অবস্থান। বিপ্লবীরা এই সারবান সেটের বৈশেষিক ব্যক্তিকে খতম করার কাজটা করতে পারবেন না, অথচ B সেটের ব্যক্তি বিপ্লবীদের অস্ত্র জোগান দিতে পারবেন। অর্থাৎ G নিজেকে খতম করার জন্য বিপ্লবীদের অস্ত্র জোগান দিয়ে ও নিজেকে এমন অশরীরী করে ফেলবেন যে তাকে খতম করা যাবে না। ভূতকে কি মারা যায়।

অতএব $G \varepsilon B$ একই সঙ্গে সম্ভব ও অসম্ভব সূত্র। আনন্দবাজারের প্রতিবেদকের বচনটিও চমৎকার।

সেই বিভাগের অধিকর্তা ফ্রাস্টুর মাইশোরের ভাড়া বাড়িতে এসে বলেছিলেন, যে তিনি যাই করুন, যেমন বাৎসরিক ন্যূনাধিক ১০ লাখ টাকা হাওলা দিয়ে ছেলেকে সামচাচার দেশে পড়ানো অথবা নিজের বৌকে নিজ বিভাগ থেকে মাসিক থোক মাইনের বন্দোবস্ত করা ইত্যাদি কোনো ক্ষেত্রেই তাঁর হাতে কোনো দাগ লাগে না (যেমন, 'সীমাবদ্ধ'র ম্যানেজারের হাতেও কোনো দাগ লাগেনি। তিনি পাঁচ আঙুল তুলে তাঁর সাফ হাত দেখিয়ে দিয়েছিলেন)। তিনি তাঁর অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসারকে দিয়ে সব 'করিয়ে নেন'।

এই 'সাংঘাতিক' গপ্পের শেষে যেটা শেকভিয়ান টার্ন, তা না বলে আর পারছিনা। মৃত ভোলার দুই বোন, রাখি আর গীতা স্বঘোষিত শ্রমিক ফ্রাস্টুর সামান্য-উন্নত বস্তিতে খেপে ঝি গিরি করে।

এ হেন স্বঘোষিত 'শ্রমিক'কে আমার মতো নাদান আর একটাই প্রশ্ন করেছিলো, "হ্যাঁরে, এমন সব পুকুর চুরি থুড়ি ডাকাতির কোনো স্ক্যাম প্রকাশ্যে আসে না কেন? আমি যদি কারোর টাকা মারি তো আমার হাজত বাস হবে!"

হাজত বাস যে হয়নি তা' নয়। সবাই যে ছাড় পেয়ে যাবে এমন কোনো কথা নেই। এক সাহেব, গ্রাহাম আভেরি চটকলের শেয়ার ধরতে এসেছিলো এখানে গত শতকের নয়ের দশকে — যখন বেশিরভাগ চটকলের মালিকানা আদালতের নির্দেশে চলে গেছে রামাবতারের মতো কোন বড় আড়তদার বা পাওনাদারের হাতে। তা' আভেরি প্রতি শেয়ার ইউনিট ৬ পেন্সের বিনিময়ে কিনে প্রচুর প্রতিশ্রুতি দিয়ে কাজ চালাতে শুরু করলেন এবং মে '৯৯-তে আঞ্চলিক PF-দফতর তাঁকে PF-defaulter হিসেবে সাব্যস্ত করে গ্রেফতার করিয়ে ছাড়লেন। আভেরি তারপর কোনক্রমে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে (কি করে?) সেই যে পাততাড়ি গোটালেন যে আর এমুখো হন নি। আচ্ছা, আভেরি না হয় PF-defaulter, কিন্তু আমাদের স্বভূমির মানুষরা — চটকলের ভাড়াটে মালিকরা? তাঁরাও তো একই দোষে দোষী! একি শুধু সাহেব-বিদ্বেষ? এক বৃদ্ধ শ্রমিক ভালো বলেছিলেন সে সময়, "পরদেশীয়া বেনিয়াকা বাৎ তুমলোগ বোলতা হ্যায়। আরে ও লোগ তো আচ্ছা রহ্যা। দেশওয়ালি যো করতা হ্যায় ও বোলতা নেহি কিঁউ?" কিন্তু ন্যাতা বলেন, "মার শালা সাহেবকে।" অবশ্য, থ্যাংকস টু ইন্দিরা গাঁধী, PF-defaulter বলে কিস্সু হয় না। গত শতকের আটের দশকে রুগ্ন কারখানার মালিকরা এশিয়ার মুক্তি সূর্যের কাছ থেকে মারাত্মক একটা ছাড় পান। কর্মীদের PF থেকে লোন নিয়ে কোম্পানি চালিয়ে তাঁরা সেটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ফেরৎ দিয়ে দিতে পারেন। কিন্তু তিনি এই

ধার নেওয়ার পরেই কি কারণে জানি 'দেউলিয়া' হয়ে যান। ফলে তাঁর পক্ষে আর কর্মীদের পয়সা ফেরৎ দেওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না। এই দেশওয়ালি ভাড়াটে মালিকরা যেসব ইনজিনিয়াস মেথড বের করেছেন, তা' *শ্রীশ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড*-কেও হার মানিয়ে দেবে। আমি তাই এই অধ্যায়ের নাম দিতে পারি 'চটমিলে গরমিল' — বেশ লালমোহনী নাম।

৪. 'ভালো' পুঁজি-'পতি'-হওয়ার লক্ষ্যে —

আমি তখন মনের আনন্দে 'সিটিজেন কেন' নয়, 'গুরু' ছবিটা ফের দেখছি। আহা, কি ভালোই না ছবিটা। গুজরাটি গাঁয়ের ছেলে ফেল ফেল্টু ফেলু গুরুকান্ত দেশাই পড়াশোনার পাট চুকিয়ে ইস্তাম্বুল পাড়ি দেয়। সেখানে গিয়ে ফাটকা-জুয়োর চালাকিবাজীটা শিখে ফেলে। তারপর, সেখানকার কোম্পানির প্রোমোশনের তোয়াক্কা না করে মুম্বাইতে এসে ব্যবসা ফাঁদে। সেই ব্যবসা ফাঁদার অপূর্ব সব কায়দাকানুন এই ছবিতে দেখানো হয়েছে, যার অনেকটাই দু'নম্বরী খেলার নিজস্ব ছক। কিন্তু নীতিবাগীশ এক সংবাদপত্রের দৌলতে (সেটা, খুব আশ্চর্য ব্যাপার, এক *বাঙালি* সমাজবাদীর পরিচালনাধীন এবং এক তরুণ *বাঙালি* সাংবাদিকের অকুতোভয় আপোষহীন 'সত্য'-অনুসন্ধিৎসার ব্যাপার আছে ফিলিমে) ফেঁসে যায় গুরু। গুরু *অসুস্থ* অবস্থায় কমিশনের আনা অভিযোগগুলোর উত্তর তার স্ত্রীকে দিয়ে দেওয়ায়। এবং শেষ অব্দি, সে স্বয়ং তার অসুস্থ অবস্থার মধ্যেই কমিশনের সামনে ফাটাফাটি একটা বক্তিমে দেয়। যা গ্রেট ডিক্টেটরের শেষ বক্তৃতাকেও হারিয়ে দেবে। তার মোদ্দা কথা হল, প্রচলিত সরকারি আমলা ব্যবস্থার মধ্যে তার মতো 'সাধারণ পাব্লিকের' এর বেশি কিছু করার ছিল না। কমিশনের বিচারকরা তাঁকে আর্থিক দণ্ডের বেশি কিছু দেন নি। গুরু, একদম ফাটিয়ে দিয়েছো গুরু!

ছবিটা দেখতে দেখতে আমি যেন বড়লোক হওয়ার দিশা খুঁজে পাই — থুড়ি বুদ্ধিমত্তার দ্বারা, জেদের জোরে যে কত মহৎ কার্য হতে পারে তা' তো বুঝলুম, কিন্তু খটকা লাগলো দুটো জায়গায়। প্রথমত গত শতকের ৬-এর দশকে পলিয়েস্টারে ব্যবসা শুরু করে গুরু। সূতীবস্ত্র এবং চটশিল্পের লাইফ হেল করে দিয়েছিলো এইসব পলিসিন্থেটিক পণ্য। আমরাও কবে যেন আমাদের হাত থেকে চটের ব্যাগ ফেলে দিয়েছিলুম। এখন সারা বিশ্বজুড়ে পলিমারের ওপর সবুজ নিষেধাজ্ঞা। এসময়ে চট নিয়ে ইনোভেটিভ ব্যবসা জমবে ভালো। দ্বিতীয় খটকা: গুরুর কোম্পানির নামে 'পরিবার' কথাটা রয়েছে। গুরু সেই দিশি ম্যানেজিং এজেন্সির মতো 'পরিবার'কেন্দ্রিক। গুজরাটের আহমেদাবাদের মতো orthogenetic শহরের (যে শহর সাবেকি

প্রথায় কাঞ্চী-মাদুরাই-উজ্জয়নীর মতো অ-সাহেবি) ছাপ তার ওপর পড়েছে বটে, পড়েও নি বটে — সেখানকার পারিবারিক ব্যবসার ঐতিহ্য সে কোনো না কোনো ভাবে বহন করছে; উল্টো দিকে মুম্বাই-এর মতো heterogenetic শহরে (যে শহর সাহেবিয়ানায় উদ্ভূত, নবীন শিল্পোদ্যোগ এখানে, যা মূলত পারিবারিক এজেন্সি নয়, পাবলিক ইস্যু ভিত্তিক শেয়ারের ওপর নির্ভর করে) গুরুভাই যে ব্যবসা করে তাতে যেমন থেকে যায় 'পারিবারিক' শহরের পরোক্ষ উত্তরাধিকার এবং একই সঙ্গে নবীন শিল্পোদ্যোগী ও ব্যবসায়ীর মুম্বাই-নির্ভর heterogenetic পরিসর। গুরুভাই-এর কোম্পানির নাম *'শক্তি পরিবার'* এটা লক্ষ্য করার বিষয় যে নামে-কামে একটা যেন ortho-heterogenetic সংমিশ্রণ ঘটছে। শুধু তাই নয়, বণিক সভা যখন থেকেই স্বার্থগোষ্ঠী হিসেবে কাজ করতে শুরু করলো, তখন দুটো বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়: (১) যৌথ পারিবারিক ধাঁচার ছাপ; (২) অঞ্চল-ভিত্তিক অথবা জাত-ভিত্তিক বা কৌমের ধাঁচার ছাপ। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে নেশন স্টেটিস্ট প্র-কল্পনার বিভিন্ন মড্যুল্‌সগুলো যেন খেলা করতে থাকলো। পরিবার আর গোষ্ঠীর নানান মড্যুল্‌স ইস্তাম্বুল, সানফ্রান্সিস্‌কো বা কোলকাতার মতো ortho-heterogenetic শহরে কেমন ভাবে কাজ করেছে, তা না বুঝলে এখনকার চটকলের সিউডো-মালিকানার চরিত্র বোঝা দুষ্কর।

কোলকাতায় শেঠ-বসাকদের আগমন ১৬৩০ থেকেই। এই সময়টা খেয়াল না রাখলে এর সাহেবি নগরায়নে ortho ও দেশী hetero-র মিশ্রণ বোঝা যাবে না। কোলকাতার আশপাশের চটকলগুলোতেও লক্ষণীয় ভাবে এই সংমিশ্রণ এবং পারিবারিক ও গোষ্ঠীগত আধিপত্য আছে। ডেল্টা, চাঁপদানি, লাডলো, একতা, বিড়লা জুটের পাবলিক ইস্যু আছে অর্থাৎ বাজারে শেয়ার ছাড়ে। বেশিরভাগ ম্যানেজিং এজেন্সি থুড়ি লাইসেন্সি মালিক/লীজ-সাবলীজের ভাড়াটিয়া আড়তদার-মহাজন-মালিক বাজারে শেয়ার ছাড়ে না বরং ক্ষতিপূরণের সরকারি টাকা, ব্যাঙ্কের ঋণ, শ্রমিকদের কাছ থেকে ঝাড়া টাকা দিয়ে ভিন্ন কোম্পানিতে লগ্নি করে। এখানে অনুৎপাদক সাবেকি বেনের সঙ্গে অনুৎপাদক ফিনান্সিয়াল বুর্জোয়া (ফাটকাবাজ?) নবীন শিল্পোদ্যোগী(?)-দের সহাবস্থান ও সংমিশ্রণ অথবা প্রদত্ত বর্গগুলো বিলুপ্তিকরণ লক্ষণীয়।

তাহলে 'বুর্জোয়া' নামক বর্গটিকে যেন সারবান সমসত্ত্ব 'একটি' সত্তা হিসেবে মেনে নেওয়া যাচ্ছে না। যাঁরা মনে করেন যে 'বুর্জোয়া' নামক একটি সামান্যীকৃত সেট আছে তাঁরা এখানে মুশকিলে পড়বেন, ঠাঁই ঠাঁই করে গুলি মেরে এঁদের উড়িয়ে দিলেই এই 'বুর্জোয়া'-ব্যবস্থার অবসান হয়ে যাবে এমনটা নয়। বরং চটকলের মালিক(?)-রা দেখিয়ে দিচ্ছেন কিভাবে 'অদৃশ্য'

হয়ে অদৃশ্য সাফ হাতের হাতসাফাই করতে হয়।

এমন ভাবনার মধ্যেই ফ্রাস্টুর প্রবেশ ঘটে এবং গোদা একটা প্রশ্ন করে বসে, "আচ্ছা, তুই কেমন শিল্পপতি হতে চাস? ভালো না খারাপ? GentleMAN Capitalist নাকি Amateur Capitalist?

— সেটা কিরকম ব্যাপার? এতো ইংলন্ডের প্রাচীন ক্রিকেট টীমের মতো ভাগাভাগ।

— ধর যেমন *শাখাপ্রশাখা* ফিলিমের ভালো শিল্পপতি, যাঁর বেস্ট পলিসিই হল গিয়ে অনেস্টি। তিনি দু'নম্বর ছায়া খেলাটা জানেন না। আর ঐ 'খারাপ শিল্পপতি' হল গিয়ে ঐ চটকলের ভাড়াটিয়া (না-)মালিকরা। অর্থাৎ 'ক্যাপিটালিজম্' নামক নির্মিত বর্গ বা ঐতিহাসিক প্রাক্‌সিদ্ধর মধ্যেই এমন কোনো মানদণ্ড আছে, যা দিয়ে 'ভালো'-'খারাপ' বিভাজন করা যায়।

— না রে, আমার খুব 'ভালো' ক্যাপিটালিস্ট হতে ইচ্ছে হয়। আমি চটকলের আধুনিকীকরণ করবো ...

— তাতে শ্রমিক সংখ্যা তো কমবে।

— কমুক, ক্ষতি নেই। একটা জায়গায় কারখানা বানাতে গেলে যেমন পোকামাকড়-কীটপতঙ্গ ইত্যাদি মাইক্রোফনা বা জীবজন্তু গাছপালার খোঁজ রাখি না, তেমনি ভালো ক্যাপিটালিস্টের মাইন্ডসেট হওয়া 'উচিৎ' শ্রমিককে তোয়াক্কা না করে যন্ত্র-নির্ভর উৎপাদনে মন দেওয়া। ওরা বাড়তি, বোঝা, রিডানডান্ট — মাইক্রোফনার মতোই। আমি আমার স্বপ্নের চটকলে সার্কুলার লুম বসিয়ে শ্রমিক কমানোর চেষ্টা করবো বা শ্রমিককেই যন্ত্র বানিয়ে দেবো। যাক সে কথা, আমি এবার চেষ্টা করবো পাটজাত হস্তশিল্পের চমকদার বাজার ধরতে। এই দেখ, Indian Jute Research Industries Association (IJRA) কেমন নিসর্গ বন্ধু Rice Bran Oil প্রযুক্তি বের করেছে পাটের সংমিশ্রণে — এই মিশ্রিত বস্তুটি দিয়ে খাদ্যবস্তুর প্যাকেট তৈরি করা যাবে। ভালো জাতের পাট দিয়ে কার্পেট বানিয়ে কোটি টাকায় বেচবো। পাট থেকে কাগজ তৈরির কথা বলেছেন টীটাগড় পেপার মিলের প্রাক্তন ডিরেক্টর পিনাকী সেনগুপ্ত। কাগজ কলের সাম্প্রতিক সব্বোনাশের দিনে আমি পাটতন্তুজাত কাগজ বানাবো। Conspicuous consumption-এর বন্দোবস্ত করবো। পাট চাষের ক্ষেত্রে মাইক্রো-বায়োটেকের সাহায্য নেবো ...

— তার মানে তুই হবি ইনোভেটিভ্ আঁতেপ্রেনার। বেশ কথা। পার্টি-পলিটিক্‌স, সূতীবস্ত্র

লবি সামলাতে পারবি তো? জানিস তো কুজনে বলে শংকর সিং বাঘেলা, আমাদের বস্ত্রমন্ত্রী যে রে, তার নাকি পলিমার কারখানা আছে। আমাদের রাজ্যে প্রস্তাবিত কেমিক্যাল হাবও কিন্তু পলিমার উৎপাদন করবে।

— একি বিরোধাভাস! একদিকে যা নিষিদ্ধ, আর একদিকে সেই পলিমারই উৎপাদন হবে। মাথায় ঢুকলো না ব্যাপারটা।

— এ সমস্ত কিছু মাথায় ঢোকাতে গেলে আগে তোর মধ্যে বং ন্যাশানালিটির বোধ জাগাতে হবে। তোকে লড়তে হবে বং-দের হয়ে নানান সম্প্রদায়-ভিত্তিক চেম্বারস্ অফ কমার্সের লবির সঙ্গে। এই লবির চাপেই সাতের দশকে পাটবাণিজ্য ঝাড় খেয়েছিলো। ওপারে যেহেতু পাটের জমি চলে গেছিলো, তাই এখানে পাটের চাষ বাড়াতে ধান ও পাটের বাজার মূল্যের অনুপাতে স্বাধীনতার পরপরই ঠিক করা হয়েছিলো ৩ : ১। অর্থাৎ ৩ মন ধানের বদলে ১ মন পাটের বিনিময়ে পাট চাষীর লাভই হওয়ার কথা। কেন্দ্র-সরকার নিবেদিত প্রাণ হয়ে পশ্চিমবঙ্গকে অনুরোধ করলেন পাট চাষের জমি বাড়াতে (২,৬৬,০০০ একর থেকে ১১,৪৪, ০০০ একর) কিন্তু কার্যত ঘটলো কি? এতে কার লাভ হলো? রণজিৎ রায় থেকে পড়ছি শোন:

স্বাধীনতার প্রথম দিনটিতেই পশ্চিমবঙ্গ সরকার আবিষ্কার করে যে, পূর্ব রাত্রে ঘড়িতে বারোটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকার পাটজাত পণ্যের রপ্তানি শুল্ক থেকে পশ্চিমবঙ্গের প্রাপ্য অংশ এক কোপে ছেঁটে ফেলেছে।

১৯৩৭ সালে নিয়েমেয়ারেব নির্বন্ধে পাট-উৎপাদক রাজ্যগুলো রপ্তানি শুল্কের ৬২.৫% পেত। তখনকার বাংলা সারাদেশের মোট পাট উৎপাদনের ৯০% করতো। আর ১৯৪৭-এর ১৫ই আগস্ট বং-এর ওপর নেমে এল কোপ: বং পাবে ২০% আর কেন্দ্র পাবে ৮০%। শুধু তাই নয় ১৯৭৩ সালে, আমাদের তৎকালীন বং কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী দেবী চাটুজ্জে ঘোষণা করেন, পাট ও ধানের ১ : ৩ অনুপাত 'সেকেলে' ধারণা। রণজিৎ রায় চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন তুলো-লবির চাপে কিভাবে পাট চাষীদের মেরে ফেলার 'কেন্দ্রের চক্রান্ত' করা হয়েছিলো। 'দার্শনিক' বাণিজ্যমন্ত্রী দেবী চাটুজ্জে সম্পর্কে রণজিৎ রায়ের *ধ্বংসের পথে পশ্চিমবঙ্গ* 'বই' এর "লুণ্ঠিত পাট চাষী ও পাট উৎপাদক রাজ্য সমূহ"-নামক কান্না জাগানিয়া নিবন্ধের ১৩ নম্বর পাদটীকার শেষাংশটা পড়:

সম্ভবত তিনি (দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়) বুঝে নিয়েছেন, পাট চাষীদের স্বার্থের কথা তুললে,

অন্যান্য মন্ত্রী, আমলাতন্ত্র এবং তুলার লবি তাঁর মন্ত্রীসভায় থাকাই অসম্ভব করে তুলবে। (৭৩ পাতা)

ফ্রাস্টুর কথা মতন আমি নিবন্ধটা পড়তে শুরু করলুম। রাগে সর্বশরীর রি রি করে উঠলো — 'কেন্দ্রের চক্রান্ত' নামক কন্সপিরেসি থিওরি আমার বং ন্যাশানালিটির হারিয়ে যাওয়া বোধকে পুনঃ জাগ্রৎ করে তুললো। কিন্তু আমি কি হব? 'ভালো' না 'খারাপ' ক্যাপিটালিস্ট? ফ্রাস্টু জনান্তিকে বলে, 'ক্যাপিটালিজম্' নামক নির্মিত বর্গের মধ্যে থেকেই তাহলে তোকে ভাবতে হবে, ঐ নির্মিত বর্গের নর্মে/মানদণ্ডে বা লজিকের ভেতরে থেকে কে দুর্নীতি করছে বা করছে না — কে 'ভালো' আর কে 'খারাপ', কে 'দুর্নীতি'গ্রস্ত আর কে নয়! তবে কিনা 'ভালো' আর 'খারাপ' ক্যাপিটালিস্ট দুজনেই শ্রমিকের বাড়তি শ্রম চুরি করে — দুজনেই যেন সমান্তরাল আলোক সরলরেখা, কয়েক আলোকবর্ষ পেরিয়ে তারা কোনো এক জায়গায় মিলেমিশে একাকার হয়ে যাবে। আর এখন কি হচ্ছে বলতো? অনুৎপাদক ফিনান্স ক্যাপিটালিস্ট 'পুঁজি-উৎপাদিত পণ্য-টাকা'র চক্করে না গিয়ে কেবল টাকা থেকে টাকার চক্করে ঢুকে পড়ছে। ক্লিশে হয়ে যাওয়া ফর্মুলা মাফিক তুই এখন লিখতেই পারিস M - C - C′ - M′ এর বদলে খালি M - M′ এবং তারপর রেকারিং ডেসিমাল বসিয়ে দিতে পারিস।

— বারে, উৎপাদন হবে না, শ্রমিকের বাড়তি শ্রম থাকবে না, M - M′ কি হাওয়ায় ঘুরবে? আর ঐ M′ - M′ - M′ ... তো কেবল একটা বিনিময় *'চিহ্ন'* মাত্র সরকারি স্বাক্ষরিত কাগজ বা দুটি অসম বস্তুকে সমান করে![৫]

— শ্রমিকের বাড়তি শ্রম আছে — অনেককাল আগে মরে গেছে যেসব চাষাভুষো শ্রমিক নক্ষত্ররা, তারা আজো আলো দেয়। ডায়াক্রনিকালি আমি মড়া শ্রমজীবীদের উৎপাদন ভাঙিয়ে টাকা থেকে টাকা, টাকা থেকে টাকা করে চলি ... টা - টা′, টা - টা′ ... টাটা, টাটা। এক ভুতুড়ে গপ্পো! বহুকাল আগে মড়া শ্রমিকের, কৃষকের শ্রম আজ পুঞ্জীভূত হয়ে আমাকে আজ ডিভিডেন্ট দিচ্ছে ...

৫. শ্রমিক — ভুতুড়ে, নশ্বর নেই!

যে শ্রমিক মহাল্লায় যেতে আমার গা ঘিন ঘিন করে, সেই মহাল্লার এক কোণে বসে দেখি সেদিন ফ্রাস্টু মাংসের ছাঁট সহযোগে বাংলা খাচ্ছে এবং তার সঙ্গে গাঁজা টানছে। এবং অবশ্যই

[৫] Marx (১৯৭৩ : ১৬৩, ২২১, ২৩৪, ৮৩৮ পাতা)

মালের ঘোরে রক্তকরবীর ফাগুলালের ডায়লগ আওড়াচ্ছে।

আমি এই অনাছিষ্টি কাণ্ড সইতে পারলুম না। ওকে ওখান থেকে টেনে বের করে আনার চেষ্টা করলুম। কিন্তু, ওকে আজ রক্তকরবীতে পেয়েছে। ও বললো, "তুই তো এ্যাদ্দিন ৬৯-এর ঙ নম্বরওলা শ্রমিক বা খনি মজুর চিনতিস। আজ আমি তোকে নম্বরহীন Null শ্রমিক[৬] চেনাবো। ভুতুড়ে শ্রমিক চিনবি নাকি?" এই বলে টলতে টলতে বলতে লাগলো:

— এই দেখ এ হল বিশু। এই কদিন আগেও স্থায়ী শ্রমিক ছিল। বিশ বছর কাজ করে এখন VRS-এর অনৈচ্ছিক কাজটা ওকে করতে হয়েছে। বকেয়া পাওনার চেক প্রথমটা ভাঙাতে পেরেছিলো, দ্বিতীয়টা বাউন্স করেছে। PF-এর সুদ সমেত কত হিসেব হয়, ন্যায্য গ্রাচ্যুইটি কত ও জানে না। তবে এখন ওকে পুনর্বহাল করা হয়েছে। আগে পেত দৈনিক ২১৭ টাকা, এখন পায় দৈনিক ১০০ টাকা। এর নাম্বার এখন জিরো — ৬৯-এর ঙ নয়। শ্রমিক সুরক্ষা আর ওর নেই।

[৬] অর্থনীতির মূলধারার কোনোটাই এই Null worker-এর আখ্যানে সম্মতি দেবে না, বরং তাঁরা যে সব বর্গের কথা পাড়বেন তা 'বেকারত্ব' নামক একটি বিশেষ ধারণার উপবিভাজন হিসেবে উপস্থাপিত হবে। তাঁদের বর্গগুলো এইরকম: Fictional unemployment, casual employment ও অবশ্যই কেইনসীও বেকারত্ব (আকাঙ্ক্ষিত ও অনাকাঙ্ক্ষিত — দুইই)। এসব ক্ষেত্রেই মোদ্দা ধ্রুপদী দাওয়াই হল মজুরির হার কমানো এবং বেকারত্ব ঘোচানো। এবং এই দাওয়াই এর কথা চটকলের যে কোনো ত্রিপাক্ষিক চুক্তির সময় রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী ও শ্রমসচিব দিয়ে থাকেন। মুদ্রাস্ফীতি, মজুরির দরকষাকষি ইত্যাদি এই বেত্তান্তের আখ্যানকারের কাছে পুনরুক্তি মাত্র, উক্তি একাধিক: বেকারের সংখ্যা অপটিমাম রেখে জন-অসন্তোষ এড়ানোর কৌশল এবং বেকারকে সাকার করেও 'আকার' (Form-al) না করার পদ্ধতি। কিন্তু এহো বাহ্য: উদ্বৃত্তশ্রমদানকারীকে যথা সম্ভব রিডানড্যান্ট করে তোলা, গোদা অর্থে 'লিখিত' পরিসরে না নিয়ে এসে 'কাজ' হাসিল করা, যন্ত্রে পরিণত করা অথবা যন্ত্র দিয়ে বিকল্পিত করা এবং অবশেষে মড়ায় পরিণত করার কৃৎ-কৌশল সাব্যস্ত-করা B-সেটের অন্তর্ভুক্ত নিরবয়বরা করে ফেলেছেন। নিরবয়ব অশরীরী উদ্বৃত্তশ্রমদানকারীকে 'বাড়তি' বিধায় পরিত্যাগ করবেন দুটি প্রক্রিয়ায়: নানান বর্গ বিভাজনে প্রলেতারিএৎ জোটবদ্ধ সমসত্ত্ব শ্রেণি 'হয়ে উঠবে' না এবং দ্বিতীয়ত শুধু মানবের যন্ত্রীভবন বা যন্ত্রবিকল্পন নয় (এখানে জরুরী হবে ছোট বয়সের প্রাক্ ক্যাপিটাল মার্ক্সের একটি ধারণা: estranged labour), বাড়তি শ্রমদানকারীকে চিহ্ন-হীন করে দেওয়া — তার গায়ে নাম্বারের টিকিট লটকানো যাবে না। ধরে নেওয়া B -সেটের বাসিন্দারা নিদারুন সাইকোটিক — তাঁদের এই চিহ্ন -বর্জনের তরিকা শেষ অব্দি ভিন্ন এক বায়বীয় (solid যেখানে গলে হাওয়া হয়) পরিসরে টেনে নিয়ে যাবে: M - M′ -এর পরিসর। এখানে যেটি লুপ্ত হচ্ছে (উহ্য নয়) সেই C - C′ আবর্তন আর বেশিদিন সম্ভব নয় স্রেফ নৈসর্গিক স্বত্বাধিকার বা Ecological Entitlement-এর দরুন।

— এই দেখ এ হল **স্পেশাল বদলি** শ্রমিক শ্যাম। পাড়ার দাদাকে ধরে ২২০ দিনের একটা কাজ বাগিয়েছে। তা' মনিব ওকে বলে কিনা দুটো মেশিনে একসঙ্গে কাজ করতে, যা দৈহিকভাবে অসম্ভব। অতএব ও করলো কি

— অন্যদিকে ধরে আনলো। নিজের মাইনে থেকে একটা অংশ দিয়ে, ওকে কাজ শিখিয়ে পড়িয়ে কাজে লাগালো। ও হয়ে গেল **ভাগওলা বা ভাগী**। দেখ ওর হাতের আঙুল উড়ে গেছে তীব্র বেগে ঘোরা মেশিনে। ও আর কাজ করতে পারে না, ক্ষতিপূরণও পায় নি।

— এই হল কিশোর। পে রোলে ওর নাম নেই। Null শ্রমিক — এখানে বলে **ভাউচার** শ্রমিক। ভাউচারে বেতন নেবার সময়, যে দাদা ওকে রিক্রুট করেছিলো তাকে কিছুটা ভাগ দিতে হয়। ঐ ধর দিনে যেদিন যেমন পায় — ৩৫ বা ৭০ টাকা।

— এই দেখ ফাগুলালকে — ও এখন নবিশ — **ট্রেনী অ্যাপ্রেন্টিস**। দৈনিক ৭০ টাকা ওর পাওয়ার কথা। চুক্তি পাঁচ বছরের, তাও সে চুক্তি হবে তিনমাস কাজ করার পর। ১৫ দিন কাজ করেই পালিয়ে এসে আমাদের মহাল্লায় ঢুকেছে, এখনও মাইনে তোলে নি — মাইনে তোলার ইচ্ছেটাও গেছে হারিয়ে।

— আর এ হল তপনদা। পুরোনো স্থায়ী কর্মী। রাদ্দিন পাউচ প্যাকেটে সস্তা চোলাই খায় আর বৌকে নিয়ে একটা পানবিড়ির গুমটি চালায়। তুই একে জুটমিল নিয়ে কোনো প্রশ্ন করতে যাস না। ও কোনো কথা বলবে না, বরং বিনা বাক্য ব্যয়ে তোকে কেলিয়ে দিতে পারে।

— এইবার দেখ প্রশান্তকে। **কন্ট্রাক্ট লেবার**। এদের জন্য খাতায় কলমে ই. এস. আই.-এর বন্দোবস্ত আছে বটে, কিন্তু মালিক তো আর সেটা জমা দেয় না। কি আর করা যাবে।

— এইবার এই দেখ ৬৭ বছরের বুড়ো রামান্নাকে, ওকে মিল এখনো রিটায়ার করায়

যতটা কাঁচামাল পৃথিবীর বুকে আছে তা ব্যবহৃত হতে হতে হতে তলানি হলে, সাব্যস্ত করা 'প্রাকৃতিক' সম্পদ ফুরোলে যে ক্যাঁচাল তৈরি হবে (ভবিষ্যৎ কাল), তাতে না যাওয়াই 'ভালো' — C - C′-এর বর্জনে তথাপি C একাকী উহ্য থাকবে কেবল সভ্যতার 'অগ্রগতি'-'প্রগতি'-'উন্নতি'-তে যেসব মড়া শ্রমিক বহুকাল আগে ঐ C-এর নির্মাণ করেছিলো — তাদের দৌলতে।

Null worker বাড়তি শ্রম দেয় অথচ দেয় না — এমত উক্তিতে যে বিরোধাভাস আছে তা আদতে গোদা অ-দেরিদীয় অর্থে লিখিত-অলিখিত পরিসরের চেনা বিভাজন। এখান থেকে দেরিদীয় অর্থে লিখিত-অলিখিতের কোনো একটিকে আপেক্ষিক গুরুত্ব প্রদানের তরিকা থেকে বিরত থাকলে যা বলতে হবে, তা তো এই বাড়তি শ্রমদানের প্রত্নলিখিত (Arche writing) পরিসরে লেখা নেই/আছে স্বর্ণাক্ষরে Null Worker!

নি। রিটায়ার করার সময় যে থোক টাকা দিতে হবে, তা চটমিলে 'নেই' এবার ওর মতো 'পুরুষ'-আনুক্রমিক দক্ষ তেলুগু শ্রমিক দিয়ে এখনো খাটিয়ে নেয় মালিক (?)। কাজ করতে করতে হাঁফিয়ে উঠে ইচ্ছে করে কখনও নিজের আঙুল কাটে, কখনও বা পায়ের ওপর ভারি জিনিস ফেলে দেয়। তাতে ওর মিলটায় অন্তত সবেতন ছুটি মেলে, চিকিৎসার টাকা মেলে।

— এইবার একে দেখ। এর নামটা আমার ঠিক মনে পড়ছে না। চটকলে কাজের আশায় ইউনিয়নের ভোলাদাকে টাকা দিয়েছিলো। ভোলা হল গিয়ে আমাদের বরানগর পৌরসভার কমিশনার কাম LC মেম্বার বাসুর শালা। ভোলা ওর মতো অনেকের টাকা ঝেড়ে চাকরি দেয় নি। তা এ ব্যাটারা ভোলার বাড়ি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ভোলাকে খুন করতে চেয়েছিলো। বাসুদা আগেই খবর পেয়ে ভোলাকে সরিয়ে দেয়। বাসু আর ভোলা খুব বড়লোক — নামে বেনামে কত সম্পত্তি আছে, তার ইয়ত্তা নেই। কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য বাসু একটা বড়ো কালিপুজো করে। চাঁদা না দিলে LC অপিসে তলব করে। এটাও 'বিচ্ছিন্ন' ঘটনা। হ্যাঁ, এবার বলতে হয় দৈনিক কাটৌতির কথা। মালিকের অনেক লস হয় তো, তাই দৈনিক ১১ টাকা এঁদের সবার মাইনে থেকে কাটা পড়ে। সে টাকা ডেল্টা ফেরৎ দেয় তো বরানগর- কানোড়িয়া ফেরৎ দেয় না।

আমি এবার ইন্টারাপ্ট করি, বলে ফেলি, "কিন্তু এবার তো ৫/১/০৭ থেকে টানা ৬৩ দিন ধর্মঘটের পর ত্রিপাক্ষিক চুক্তিতে মজুরদের মাইনে অনেক বেড়েছে। ৮/৩/০৭- এর চুক্তি অনুসারে শ্রমিকরা ১.৯০ হারে ২৫৭ পয়েন্ট মাগ্‌গি ভাতা পাবেন। মিলগুলো খুললেই পাবেন ২০০ পয়েন্ট অনুসারে ৩৮০ টাকা; বাড়িভাড়া বাবদ বেসিকের ১৫% টাকা। মোট প্রায় ৪৩৭ টাকা; দৈনিক মাইনে হয়ে যাবে সবার। ১লা অক্টোবর '০৭ থেকে আরো ৫৭ পয়েন্ট মাগ্‌গি ভাতা পাবেন এঁরা — সে প্রায় আরো ১০০ টাকা।"

— বা বেশ কথা, এবার তাহলে আয় আমরা আবীর মাখি, হাতে পাট দিয়ে তৈরি রাখি বাঁধি। তুই কি ত্রিপাক্ষিক চুক্তির মানে জানিস? এক পক্ষ অবশ্যই কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের শ্রম সচিব এবং রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী মহোদয়। দ্বিতীয় পক্ষ প্রায় ১৪ বা তার বেশি ইউনিয়নের অ-শ্রমিক অথবা শ্রমিক-অন্ত-প্রাণ দরদী ন্যাতারা এবং তৃতীয় পক্ষ মালিক বর্গের দ্বারা পরিচালিত Indian Jute Mills Association (IJMA), যার সদস্য ঐ ভাড়াটিয়া মালিকরা নন। ফলত অর্ধেকের বেশি মিল মালিক এই চুক্তিতে স্বাক্ষর না করায়, তাঁদের কোনো দায় নেই যে চুক্তি মেনে কাজ করবেন। আর শ্রমিকপক্ষের ভ্যানগার্ড হয়ে যে সব পরোপকারীরা এসি ঘরে

গদিতে বসে চুক্তি করছেন, তাঁরা শ্রমিকদের ব্যাপারে জানেনটা কি? শ্রমিকরা তো তখন তাঁদের মিলের পাশে নেই — কারখানার মধ্যেকার মন-ইতিহাস ফেলে তারা তো ধর্মঘটের সময় বিহার-অন্ধ্র-উড়িষ্যায় গিয়ে তাদের ফেলে আসা মন-ইতিহাসের মধ্যে বসে আছে। যদিবা IJMA-বহির্ভূত মালিককে দিয়ে সইও করিয়ে নেওয়া হয়, তা হলে তিনি তাঁর অন্য মিলে সেই চুক্তি লাগু করবেন, এমন কোনো গ্যারান্টি নেই। সব মিলে সমান মাইনেও দেওয়া হয় না। ওয়েজ-প্যারিটি নেই। আর ১৯৮৫, ১৯৯২, ১৯৯৬-তে এমন কতই না চুক্তি হয়েছে। কে মেনেছে বে?

— তা হলে আমাকে এই 'বাস্তব'-অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বলতেই হচ্ছে যে তুই যে শ্রমিকদের ক্যাটেগরিগুলো দেখালি, তাতে নয়া ধ্রুপদী অর্থনীতি শাস্ত্রবিদ্-দের কথা অনুযায়ী আমি বেশ ভালো এক পীসমিল কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছি। এই অস্থায়ী কাজে সুরক্ষা না থাকার দরুন কামচোর শ্রমিকের সংখ্যা কমবে, ওয়ার্ক কালচার তৈরি হবে। এও তো বেশ কথা। এর ফলে যদি, শ্রমিক সংখ্যা কমে আর উৎপাদন সমান থাকে বা বাড়ে তো নয়া-ধ্রুপদী অর্থনীতিবিদ্‌রা আমার মতোই খুশি হবেন।

ফ্রাস্টু প্রথমেই রেগে আগুন হল আমার এমন কথায় তারপর একটু শান্ত হয়ে বললো, "হ্যাঁ, তোর মতন নয়া উদ্যোগপতি-র কাছে শ্রমিক তো রিডান্ড্যান্ট। তার বাঁচা মরা নিয়ে তোর ভাবনা নেই। এই তো সেদিন এক মহিলাকর্মীর কাপড় মেশিনে জড়িয়ে গিয়ে মরে গেলেন। আমরা বডি নিয়ে ধর্না দিলুম। পুলিশের জিপ আর অ্যাম্বুলেন্স লাশ নিয়ে মিলের পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। ম্যানেজার মৃত মহিলার বাড়ি গিয়ে এককালীন ৩ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ আর তার ছেলের চাকরির ব্যাপারটা নেগোশিয়েট করে চলে এলেন। সে ছেলে এখন এখানে ট্রেনী। কি আসে যায় শ্রমিক-কৃষকের মৃত্যুতে? যখন ইউনিয়ন মালিকের সঙ্গে যোগসাজশে 'ধর্মঘট' ম্যানুফ্যাকচার করে, তখন ঐ মৃত মহিলার মতোই মিলের পেছনের দরজা দিয়ে কাঁচামাল, মিলের যন্ত্রাংশ বেরিয়ে যায়। আগে শ্রমিকরা গেট আটকাতো এখন আটকায় না। মালিক যন্ত্রের ভারি ইস্পাত বেচে সেখানে সমওজনের কংক্রিট বসিয়ে দেন। কে আটকাবে এসব?

— কেন চোদ্দটা ইউনিয়ন কি করছে?

— মালিক যেমন শ্রমিকের নানা বর্গ বিভাজন করে প্রলেতারিএৎ নামক নির্মিত ঐতিহাসিক প্রাক্‌সিদ্ধের সারবান অস্তিত্বকে গুলিয়ে দেয়, তেমনি ইউনিয়নগুলোও যেদিন

"দুনিয়ার মজদুর এক হও" বলে একটা নোতুন পার্টি খোলে, তখন তৎক্ষণাৎ আর এক স্বার্থ-গোষ্ঠী প্রলেতারিএৎ-নামধারী অতিক্রান্ত সারবান বর্গটিকে অদৃশ্য মালিকের ইচ্ছে অনুযায়ী ফাটল ধরিয়ে দেয়। আবার আজকের দিনে শিউ ন্দ্রিকার মতো ডেডিকেটেড বিলুপ্তপ্রায় নেতাও আছেন, যাঁরা মালিকের থেকে মাসোহারা নেন না। কিন্তু, তাঁরা যেন তাঁদের bad faith (সার্ত যাঁকে বলেন মোভা ফোই)-এর শিকার: কেউবা বিপ্লবের স্বপ্ন দেখেন, কেউবা বিপ্লবে আস্থা হারিয়ে নিজেকে টিকিয়ে রাখার জন্য পীসমিল কিছু কাজ করেন — ফিলানথ্রপিক কাজ। দানের অর্থনীতির (যাকে সুবর্ণ যুগে [?] বলা হত **অগ্রহার নীতি**[১]) ওপর নির্ভর করে মিল দখল করে চালু করে দেন। শ্রমমন্ত্রী একাজে ক্ষুব্ধ হন — মালিকের (?) হাতে ফের চলে যায় মিল। লাগু হয় কাটাউতি। তারপর ফিলানথ্রপিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে এমন সস্তার হাসপাতাল বানান রুগ্ন শ্রমিকদের

[১] ৩০০ খ্রিঃ পরবর্তী সময়ে নগরায়নের প্রয়াস যখন পরিত্যক্ত হচ্ছে ভারতীয় রাজনৈতিক ভূগোলে, জোর পড়ছে কৃষি ও হস্তশিল্পের সংমিশ্রণে গঠিত অর্থনীতির ওপর, সে সময়ে একটি বিশেষ ব্যবস্থা চালু করা হয় এই অধিকরণে: অগ্রহার ব্যবস্থা। পুরুত অথবা ধর্মীয় সংঘকে নিষ্কর ভূদান করা হত এবং সেই ভূ-স্থানে মন্দির/মঠ/বিহার স্থাপন করে তাকে ঘিরে একধরনের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্ম গড়ে তোলা হত। এই সব ভূ-স্থানগুলো বেশিরভাগ সময়েই শ্বাপদসংকুল অরণ্য বা অনাবাদী জমি, যেখানে প্রায় রাষ্ট্রহীন ও প্রায় মুদ্রাহীন একটা বন্দোবস্ত ধীরে সুস্থে গড়ে উঠতো। যদিচ দানের ক্ষেত্রে রাজা/শাসকের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। প্রাক্ ৩০০ খ্রিঃ থেকেই কিন্তু বামুনকে বা জৈন ও বৌদ্ধ মহা সাংঘিককে দানের প্রথা ছিল — (যার ফলাফল রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত অথচ রাষ্ট্রহীন অগ্রহার ব্যবস্থা) যার প্রকাশ দেখা যায় 'কারক' হিসেবে 'সম্প্রদান' বর্গের বৈয়াকরণিক আবির্ভাবে (খ্রিঃ পূঃ ৪র্থ শতক)।

এই ধরনের দানের অর্থনীতির সংগঠন একসময় ছিল অবরোহী — ওপর থেকে নিচে নেমে আসতো — রাজা থেকে প্রজায়। আজকের গণতান্ত্রিকতায় এটি আরোহী ছাঁদ পেয়েছে খানিকটা, পুরোপুরি নয়। একটি মিল বন্ধ হলে, মিলের শ্রমিকরা 'চাঁদা' সংগ্রহ করেন সাধারণ মানুষের কাছ থেকেই, যেমনটি হয়েছিল কানোড়িয়ার ক্ষেত্রে ১৯৯৩-৯৪ সালে এবং তার পরবর্তী সময়ে একটি বিশেষ ট্রেড ইউনিয়ন দানের টাকা-পয়সা এতটাই পান যে তাঁদের কর্মসূচীতে "অ-শ্রমিকদের জন্য হাসপাতাল"-ও ঢুকে পড়ে এবং উলুবেড়িয়া অঞ্চলের অন্যতম 'উন্নয়নমূলক'-কাজ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে এখন এই হাসপাতাল। মিল ইউনিয়নের জনসংযোগের অন্যতম 'ইস্যু' এখন এটা: "জনগণের টাকায় জনগনের হাসপাতাল"। বিপুলায়তন হাসপাতাল নির্মাণের সময়ও কিন্তু কানোড়িয়ার শ্রমিকদের দৈনিক কাটৌতি বন্ধ হয়নি।

এইবার কেউ যদি 'দানের' আরোহী অর্থনীতির পর্যায়ক্রম বুঝতে চান তাহলে বিভিন্ন হিঁদু উৎসবের সংঘটনের দিকে নজর রাখতে পারেন। রাজা-গজার পুজোর খরচার অর্থ ছিল আহৃত রাজস্ব। বারোয়ারি পুজোর গণতান্ত্রিকতায় চাঁদা-দ্বারা সংগৃহীত অর্থের সিংহভাগ আসে কৃষি থেকে, কৃষকদের উদ্বৃত্ত শ্রম থেকে। বিশ্বকর্মা থেকে জগদ্ধাত্রী

মিলের পাশেই, যার শুধু রি-ইনফোর্সড কংক্রিটের ভিত বানাতেই চলে যায় ২ কোটি টাকা। ইনিই আবার টাটার মোটরের দূষণ নিয়ে চিন্তিত, কিন্তু রি-ইনফোর্সড কংক্রিটের র‍্যাডিয়েশন নিয়ে চিন্তিত নন। টাটা যদি গাঙ্গেয় পলিমাটির ওপর কারখানা করতে চান, তো উনি সেই একই পলিমাটির ওপর করেন হাসপাতাল। অতএব, আকাশ বাংলায় (দুর্জনে বলে এটা নাকি 'সি. পি. এম., তুমিই আমার এ টি এম'-এর!) তিনি বোঝাতে শুরু করেন, ২২/১১/০৬-এর বোম্বে রোড রোকোতে **গণ**মিছিল হয়েছিলো বটে জুট মিলের স্বার্থরক্ষায়, কিন্তু তারপরের 'রেল রোকো' রুখতে হয়, ওটা **মহা**মিছিলের আওতায় না আসায়। 'রেল রোকো' বন্ধ করার জন্য আর নিরামিষ পুলিশ লাগে না, ছুটে আসেন প্রস্তাবিত হাসপাতালের অন্যতম হোতা ইউ কে প্রবাসী ডাক্তার। তিনি বলেন, আমরা আকাশ বাংলার খোঁজ খবরে দেখি, "এখনো আসে নি সময়। 'গণ' যবে 'মহা' হবে, সেদিনই হবে রেল রোকো।" এসব দেখে শুনে মনে হয় সবই যেন ক্রাফ্‌টেড অ্যাজিটেশন। এই সস্তার অ-শ্রমিকদের জন্য হাসপাতালে আমিও যাবো একদিন চিকিৎসার জন্য — আমি তো আর বেশিদিন বাঁচবো না। তবে এ বড় প্যাঁচের পৃথিবী। কে কখন কাকে, স্বপক্ষ বা বিরোধী পক্ষকে সাবস্ক্রাইব করছে তা বোঝা দায়। এবার তুই কি বুঝলি বলতো এতশত কথার পর?

আমি একটু ভেবে বলি, "তোর এই পুরো চোটপাট বেত্তান্ত শুনে আমার দুটো জিনিস মনে হয়েছে। এক, রাষ্ট্রের আইনী ভূমিকা নগণ্য — স্টেট মিনিমাল হয়ে গেছে। যারা একদিন রাষ্ট্রের বিলুপ্তি চেয়েছিলো তারা এই সিউডো-লেসে ফেয়ারে অর্থনীতির জেরে তাদের প্রার্থিত রাষ্ট্রহীনতা পেয়ে গেছে। অদৃশ্য মালিক আর পার্টির ন্যাতারা মিলে রাষ্ট্রের ভূমিকাকে গৌণ করে একে প্রায় বিলুপ্ত করে ফেলেছে; চটকলের রাজত্বে রাষ্ট্র নীরব দর্শক — রাষ্ট্র নেই। দুই, অদৃশ্যমান মালিকরা শ্রমিককে রিডান্ড্যান্ট করে 'শোষণ' নামক শব্দটাকে অভিধানহীন করে দিয়েছে। আমি যদি অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য সরকারি হিসেবে শ্রমিককে null entity-তে পরিণত

পুজো অব্দি চাষীরা উৎসবের আগের ক'দিন ফড়েদের কাছ থেকে সবচেয়ে কম দাম পান শাক-সব্জির, এমনকি cash crop পাটের প্রাথমিক দামও এসময় নিম্নগামী, অথচ অন্তিম খরিদ্দার ঐসব দ্রব্য তখন অগ্নিমূল্যে কেনেন। প্রাথমিক মূল্য ও অন্তিম মূল্যের সিংহভাগ চলে যায় বারোয়ারি পুজোর সংঘটনে। দান-নির্ভর এই অর্থনীতি বোঝার জন্য স্বতন্ত্র আলোচনা প্রয়োজন। এই উৎসবের ক্ষেত্রে অবশ্য হাসপাতালের মতো স্থায়ী উৎপন্ন কিছুই তৈরী হয় না — উৎসবের জন্য যেকোনও উৎপাদনই ভঙ্গুর। এই বিশেষীকৃত দানের দেশ-কালিক অর্থনৈতিক ইতিহাস স্বতন্ত্র আলোচনার দাবি রাখে।

করি, তাহলে লিখিত পঠিত ভাবে শ্রমিক নেই — মানে উদ্বৃত্ত শ্রমের অপহরণও নেই। কেউ এক্সপ্লয়টেড হওয়ার সুযোগ পেলে তবেই তো সে এক্সপ্লয়টেড হবে নাকি? কোনো বেকার[৮] যদি পে রোলে নাম না থেকেও কাজ করে চলে, তাহলে কি তাকে আর 'শ্রমিক' বলবো? থ্যাংকস টু নিসর্গ-শত্রু অটোমেশন এবং চটকল মালিকের ingenious method — এখানেও শ্রমিকের 'শোষণ' খাতায় কলমে নেই।

আমার এমন কথা শুনে ফ্রাস্টু মাতালটা ধপাস করে পড়ে গেল। পড়ে গিয়ে হিন্দি সিনেমার মৃতপ্রায় নায়কের মতো ডায়লগ দিল, "গুরু ফাটিয়ে দিলে মাইরি। শোষণ শব্দটা বড়ো ক্লিশে হয়ে যাচ্ছিল। শোষণ নেই, রাষ্ট্র নেই — বেশ আছি না আমরা! এ বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক!"

---

[৮] ভাষার মধ্যেই যে বিশ্ববীক্ষা পোরা থাকে — এমন গোদা কথা নতুন করে বলবার মতো নয়। 'শোষণ'/exploitation শব্দটা 'সভ্য' সমাজের অভিধানে মেলে, অনেক 'অসভ্য' 'বর্বর'দের ভাষায় এ শব্দ পাওয়া যায় না:

> 'বিরসা মুন্ডা' (কিতাবটি) বিষয়ে সবচেয়ে মূল্যবান খবর আমার কাছে, যে, আটের দশকেই চাইবাসার পশুপতি জাংকো নামে এক হো আদিবাসী যুবক এ বই হো ভাষায় অনুবাদ করেন। পশুপতি, অনুবাদের সময় একবার চাইবাসা থেকে দৌড়ে আসে। ও 'শোষণ' শব্দটির সমার্থক হো শব্দ খুঁজে পাচ্ছে না, কেননা হো ভাষায় ওটির সমার্থক শব্দ নেই। (দেবী, মহাশ্বেতা, ১৯৯৮: ভূমিকা পাতা)

শোষণ না থাকলে অমন শব্দই বা থাকবে কেন? তবে এই আখ্যানে যাঁরা (B-সেটের বাসিন্দারা) 'শোষণ' বর্জন করছেন, তাঁরা হো-বিশ্ববীক্ষার উল্টো পথে যে চলছেন, একথা বলাই বাহুল্য, কেননা 'শোষণ' এখানে আছেও বটে এবং নেইও বটে। 'শোষণ' যখন আছেই, তখন B-সেটের বাসিন্দাদের প্রয়াসও আছে এমন ফিলদি শব্দকে বর্জন করার —

বিশেষ শব্দ-বিশ্ববীক্ষার অনুপস্থিতি আমাদের ভিন্ন এক ভাবনায় এগিয়ে নিয়ে যায়। অর্থনীতিশাস্ত্রের যে সার্বত্রিক বিশ্বায়িত পরিভাষা ব্যবহার করা হয়, তা' এক দেশ-কালে ঐতিহাসিক পূর্বতসিদ্ধ (historical a priori) তথা জ্ঞানাণু (episteme) হিসেবে লাগু হতেই পারে, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন দেশ কালে নানান কৌম ও নেশনের ক্ষেত্রে ঐ সার্বত্রিকতার দাবি নিয়ে উঠে আসা শব্দবোধ ও তৎসংলগ্ন মানে-তত্ত্ব প্রযোজ্য হয় কি করে? চরমপন্থী শিকাগো ঘরানার অর্থশাস্ত্রীরা যখন ভৌতবিজ্ঞানসম মর্যাদায় অর্থনীতিশাস্ত্রকে সাজিয়ে নিতে চান, তখন যে আপদ তৈরি হয়, আধিপত্যকারী চিন্তার বিশ্বায়ন ঘটে, তা' সামলাতে হলে জোরের সঙ্গে বলা দরকার, "অর্থনীতি ও তার প্রেস্ক্রাইবড় মানদণ্ড সর্ব দেশ-কালে যে সমান হবে এ কুসংস্কার বর্জন না করলেই নয়"। কেননা এক বিশেষ এলাকার শব্দবোধ ও মানে-তত্ত্ব 'অন্যান্য' এলাকার ভেতর ঢুকে পড়ে, তখন শুধু অর্থনীতিশাস্ত্রেই আধিপত্যকারী চিন্তা ঢুকে পড়ে তাই নয়, 'অন্য-'অন্য' এলাকার অর্থনীতিও ঐ আধিপত্যকারী এলাকার দাসানুদাস হয়ে যায়।

পরিশেষ: উনিশ শতকের 'প্রমারা'[৯] থেকে আজকের Monopoly game:

আমি আজ সবুজ নিষেধাজ্ঞায় বুঝে গেছি চটশিল্প এখন প্রতিযোগিতাহীন একচেটিয়া কারবার। এই একচেটিয়া ব্যবসাটা আরো ভালো করে বোঝার জন্য আমি ফ্রাস্টুকে নিয়ে বাড়ি ফিরে আসি। বের করে আনি, ছোটবেলায় উপহার পাওয়া 'Monopoly Game' বা 'ব্যবসায়ী'। আমি 'ভালো' শিল্পপতি হব, কিন্তু এই খেলাটা আমার বাবা-মা কোনোদিন খেলতে দেয় নি। আজ আমি এটা আমার ছেলে-বৌ আর ফ্রাস্টুর সঙ্গে খেলবো। এই খেলার উদ্দেশ্য, "*সম্পত্তি ক্রয়, বিক্রয়, বন্ধক ও ভাড়া দিয়ে কৃতী ও সর্বাপেক্ষা ঐশ্বর্যশালী খেলোয়াড় হওয়া।*"

আমরা ছক্কা ফেলতে শুরু করলুম। ছক্কায় কি পড়বে তা আমার অজ্ঞানতার দরুন প্রবাবিলিটির আঁক কষে বের করতে পারলুম না। তার মানে এটা এক প্রাচীন জুয়ো খেলা — জুয়ো খেলে 'ভাগ্য' মেনে 'কপাল' জোরে বড়লোক হওয়ার খেলা। আমার বাবা-মা-র নৈতিকতার কি এমন জুয়োয় আপত্তি ছিল? এখন তো তথ্যের জুয়ো দেখেছি 'কৌন বনেগা ক্রোড়পতি'তে, সুপার লোটোর দোকানে, গোপন সাট্টার ঠেকে। জুয়োর রমরমা এখন — ইমেলে লটারির ফল আসে অনবরত: আপনি এত কোটি ডলার জিতেছেন, আপনার অ্যাকাউন্ট নাম্বার দিন। সেল ফোনের SMS-এ তো অনবরত প্রশ্ন আসছে, প্রশ্নোত্তর দিয়ে প্রাইজ পাওয়ার বন্দোবস্ত আছে সেখানে —। আমার বাবা-মা আমাকে এ খেলা না শেখান, আমি আমার ছেলেকে এ খেলা শেখাবোই।

আমরা চারজনে, আমি, আমার বৌ, আমার ছেলে আর ফ্রাস্টু, এই Monopoly Game বা Hyper-real জুয়ো খেলা আনন্দের সঙ্গে শুরু করি। এই তোর কত পড়লো রে ছক্কায়? "এই ফাটকাবাজীর যুগে স্বপ্নের পাখিগুলো আর বেঁচে নেই" রে — আমি আমার ছেলেকে বলি।

[পাঠক, দয়া করে যদি একটা Monopoly Game কিনে তার নির্দেশাবলী পড়ে নেন, তাহলে আমার এ বয়ান পড়তে আপনাদের সুবিধে হতে পারে। আপনি এই খেলাটা কিনলে আমি কমিশনও পাবো]

---

[৯] 'প্রমারা' বা 'প্রমেরা' জুয়াখেলাটির ব্যাপারে জানতে হলে পাঠক দেখে নিন, ভদ্র (২০০২)।

পুষ্পিকা: এই নিবন্ধ লেখাই হত না হয়তো কোনোদিন, যদি না অধ্যাপক অশোক সেন স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে আমার মতো এক চটকল-এলাকার বাসিন্দেকে এই প্রতিবেদন লেখার আদেশ করতেন। তাঁর সঙ্গে নিরন্তর আলোচনার ফসল হিসেবে এই প্রতিবেদনটি বেরোয় *বারোমাস*, ২০০৭-এর শারদ সংখ্যায়। অতঃপর সেটি ভূপতিরঞ্জন দাসের আরেকটি নিবন্ধের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে ২০০৮-এ প্রকাশ পায় বই হিসেবে (পাটরানির কথা: বাংলার আদি শিল্পের দুই কাহন। কোলকাতা: সেরিবান) এই সম্পূর্ণ বেত্তান্তের নির্মাণে অধ্যাপক সেনের কাছে আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই।

বর্তমান নিবন্ধটি ঐ প্রকাশিত নিবন্ধেরই পরিবর্ধিত এক ভিন্ন রূপ।

এছাড়াও যাঁদের কাছে এই নিবন্ধের বিষয়ে আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ তাঁরা হলেন: শ্রী অনাদি চক্রবর্তী, নাগরিক মঞ্চের পরোক্ষ বন্ধুরা, ডাঃ প্রদীপ্ত চট্টোপাধ্যায়, বোধিস্বত্ত্ব বিশ্বাস, প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায়, সংহতির বন্ধুরা, শ্রী প্রফুল্ল চক্রবর্তী।

গ্রন্থপঞ্জী:

– Chakroborty, D. 1984. "Trade Unions in a Hierarchical Culture: The Jute-workers of Calcutta: 1920-50" in Guha, R. ed. Subaltern Studies. Vol. II. (pp.116-52) Delhi: Oxford University Press.

– Feyerabend, P. 1975/1994. *Against Method*. London: Verso.

– Hersh, R. 1997. *What is Mathematics Really?* New York: Oxford University Press.

– Mitra, S. 1981. *The Jute Workers: A Micro Profile*. Kolkata: Centre for Regional, Ecological and Science Studies in Developmental Alternatives.

– Penrose, R. 1990. *The Emperor's New Mind*. Oxford: Oxford University Press.

– Penrose, R.1994. *Shadows of the Mind*. Oxford: Oxford University Press.

– Sarkar, G. 1989. *Jute in India: An Economic Analysis*. Delhi: Oxford University Press.

Derrida, J. 1994 (1976). *Of Grammatology*.Trans. Gayatri Chakravorty Spivak. Delhi: Motilal Banarsidass.

— রায়, রণজিৎ। ১৯৭৭/৮৩। *ধ্বংসের পথে পশ্চিমবঙ্গ*। কোলকাতা: নিউ এজ পাব. প্রা. লি.

— চক্রবর্তী, অনাদি। ২০০৩-০৪। "শাসক শ্রেণীর আক্রমণ ও শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলন সমস্যা।" *কুলিশ*, ১ : ৪। কোলকাতা

— দাস, শংকর। (সাল অনুল্লেখিত)। *পাটশিল্প: অগ্রগতি না মৃত্যুর ঘণ্টাধ্বনি?* প্রথম পর্ব। ১২ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট, কোলকাতা - ৯।

রায়, রবি (সম্পা.)। ১৯৯৪। *কানোরিয়ার শ্রমিক আন্দোলন কোন পথে?* কোলকাতা: সার্চ।

— (লেখক অনুল্লেখিত)। ১৯৯৩-৯৪। *চটশিল্প-১৯৯৩: কিছু রটনা, কিছু ঘটনা।* কোলকাতা: নাগরিক মঞ্চ।

— (লেখক অনুল্লেখিত)। ১৯৯৫। *পাটশিল্পে হচ্ছেটা কি?* কোলকাতা: নাগরিক মঞ্চ।

— (লেখক অনুল্লেখিত)। ১৯৯৪। *কানোরিয়া: জীবনের জয়গান।* ফুলেশ্বর: কানোরিয়া জুট সংগ্রামী শ্রমিক ইউনিয়ন।

— (লেখক অনুল্লেখিত)। পাটশিল্প ২০০১। সংকট ও সমাধানের উৎস সন্ধানে একটি সমীক্ষা রিপোর্ট। কোলকাতা: নাগরিক মঞ্চ।

এছাড়া সংগ্রামী দিশা, আনন্দবাজার পত্রিকা, আজকাল, কালধ্বনি পভৃতি পত্রিকার সাহায্য নেওয়া হয়েছে এবং কৃতজ্ঞতার সঙ্গে ব্যবহার করা হয়েছে।